পঞ্চস্বর
মনন দাস

পঞ্চশ্বর

মনন দাস

গ্রন্থ প্রকাশনী

বালি, হাওড়া

Panchashwar
A collection of short stories

প্রকাশক ঃ মহামায়া দাস
৬০/২, ব্যানার্জী বাগান লেন
সালকিয়া, হাওড়া - ৭১১ ১০৬

বর্ণ সংস্থাপন ও অলংকরণ ঃ তিমির বসু

ই-বুক প্রকাশ ঃ ১লা জানুয়ারি, ২০২৪

মূল্য ঃ বিনামূল্যে ই-বই

লেখকের অন্যান্য ই-বই ঃ

কবিতা সংগ্রহ

www.archive.org/details/KobitaSangraha
White Flowers

www.archive.org/details/WhiteFlowers

গল্প ঃ

অন্যস্বাদ

www.archive.org/deta ils/AnyaSwad

গল্প পঞ্চক

www.archive.org/details/galpa-panchak

উপন্যাস ঃ

মনভূমি

www.archive.org/details/Manabhumi

ঝলমলি

www.archive.org/details/Jhalmali

ছুট

www.archive.org/details/chhoot

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহজ পাঠ-এর সুরারোপ

www.archive.org/details/SahajPath

কিশোর উপন্যাস ঃ

রাজু নারানের কীর্তি

www.archive.org/details/RajuNaranerKirti

ছড়ায় লেখা মজার গল্প ঃ

আটটা ঠাট্টা

youtube search Manan Das / Four Fun
youtube search Manan Das / More Four Fun

সূচীপত্র

কথা ছিল
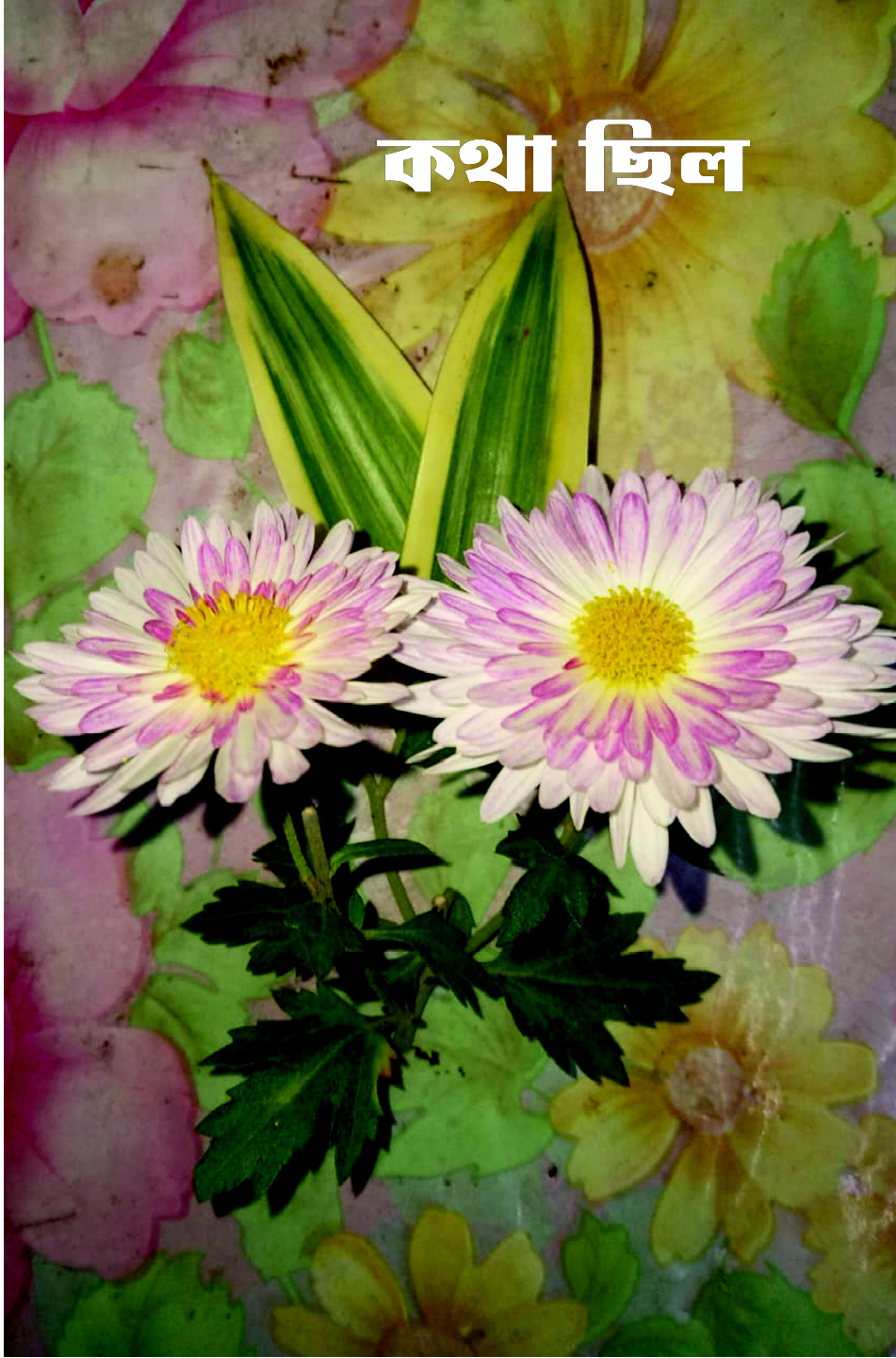
শম্ভুর চায়ের দোকান থেকে কে যেন চেঁচিয়ে ডাকল – এই অনি –

অনিকেত ব্রেক কষে সাইকেল থামিয়ে ডান দিকে তাকাল, দোকানের সামনের বেঞ্চিতে রজত বসে, রজত এবার হাত নেড়ে অনিকে ডাকল।

দোকানের সামনে সাইকেল দিয়ে জায়গা জুড়ে রাখা শম্ভু পছন্দ করে না, এ নিয়ে অনেকবার কথা কাটাকাটি হয়েছে। তাই অনিকেত সাইকেলটা রাস্তার এপারেই দাঁড় করিয়ে রেখে রাস্তা পেরিয়ে রজতের কাছে এসে দাঁড়াল, বলল – কিরে এখানে বসে? ষ্টেশনে যাবি না?

– হ্যাঁ যাবো – বলতে বলতে রজত দেখল তাদেরই সমবয়সী অচেনা এক যুবক ওদের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে সাইকেলের দিকে এগিয়ে চলেছে। রজতের সঙ্গে চোখাচোখি হতে ইশারায় হাত নেড়ে কিছু বলতে নিষেধ করে সাইকেলের হাতলে হাত রাখল।

এরকম ধরনের সাইকেল চুরির ঘটনা রজতের শোনা ছিল। যেন বন্ধুর সঙ্গে মজা করছে এইভাবে সাইকেল নিয়ে পালানো। বিশেষতঃ এই ছেলেটিকে রজত চেনে না। সুতরাং সে কালবিলম্ব না করে প্রায় লাফিয়ে রাস্তা পেরিয়ে এসে চুলের ঝুঁটি মুঠো করে ধরে দুই থাপ্পড় লাগাল, বলল – এসব কায়দা পুরোনো হয়ে গেছে বুঝেছিস? চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকিয়ে দিল।

অনিকেত কিছু বুঝে ওঠার আগেই এসব ঘটনা ঘটে গেল, সে দ্রুত রাস্তা পেরিয়ে এলো। বলল – এই এই রজত ওরে ছাড় ছাড়, ও যে আমার বন্ধু প্রদীপ। এই প্রদীপ কখন এলি? কি করছিলি?

রজত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুলের মুঠি ছেড়ে হাত গুটিয়ে নিল। আর প্রদীপের অবস্থা যে কি সঙ্গীন!

– ব্যাপারটা কি হলো আমি বুঝতে পারছি না –

অনিকেত দুজনের মুখের দিকে তাকাল।

– ও তোর সাইকেল নিয়ে পালাবার তাল করছিল, আমাকে এমন ভাবে ইশারা করছিল যেন তোকে নিয়ে মজা করবে। কিন্তু আমি তো ওকে চিনি না – কাচুমাচু ভাবে বলল রজত।

– ও আমার বন্ধু প্রদীপ, হাওড়ার শিবপুরে থাকে, একসঙ্গে এন. ডি. কলেজে পড়তাম, কখনো সখনো ও আমাদের বাড়িতে আসে, তুই চিনবি কি করে। চারটের ট্রেনে এলি বোধহয়? – শেষের কথাগুলি প্রদীপের দিকে চেয়ে বলল অনি।

– হ্যাঁ – প্রদীপ ধরা গলায় বলল, আমি দেখলাম তুই সাইকেলে আসছিস, এমন সময় ও তোকে ডাকল তাই আমাকে দেখতে পাসনি। ভাবলাম তোর সাইকেল নিয়ে তোদের বাড়ি চলে যাবো। বেশ মজা হবে –

– মজা হবে! – ভ্যাংচালো অনি – খুব মজা হলো!

– আমি খুব দুঃখিত ভাই – বিমূঢ় রজত প্রদীপের হাত ধরল।

– যাক্‌গে যা হবার হয়ে গেছে – অনি বলল – চল্ স্টেশনের আড্ডাতেই যাওয়া যাক।

প্লাটফর্ম যেখানে ঢালু হয়ে মাঠের ধারে মিশেছে সেখানে বিশাল হলুদ রঙের বোর্ডের নীচে অনেকটা জায়গায় ঘাসের আস্তরণ, রোজ বিকালে ওরা সবাই এখানে এসে জড়ো হয়। যাত্রীরা প্লাটফর্মের এই প্রান্ত পর্যন্ত আসে না। অতএব ওদের আড্ডা খুব ভালোই জমে। স্টেশনের নাম লেখা হলুদ রঙের বিশাল বোর্ড আর ইতস্ততঃ দাঁড় করিয়ে রাখা সাইকেলগুলি শুধু ওদের উদ্দাম আড্ডার নীরব শ্রোতা।

ওরা তিনজনে যখন পৌঁছাল ততক্ষণে আরও চারজন জমিয়ে বসেছে, নতুন একজনকে আসতে দেখে ওরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

– এ আমার কলেজের বন্ধু প্রদীপ; অনিকেত উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করল – আজ একে নিয়ে এক দুর্দান্ত ঘটনা ঘটিয়েছে রজত। রজতই ঘটনা সবাইকে বলবে।

– একবারতো অপমানিত হলাম, মারও খেলাম, আবার সকলের মাঝখানে বসিয়ে হাসাহাসি? – থমকে দাঁড়িয়ে ফুঁসে উঠল প্রদীপ, পরক্ষণেই নিভে গেল, আমি যাচ্ছি। – মাথা নীচু করে মৃদুস্বরে বলল সে, পায়ে পায়ে ফিরে চলল প্লাটফর্মের ধার দিয়ে। অনিকেত ওকে জড়িয়ে ধরল – আমার অন্যায় হয়ে গেছে – বলল সে – আয়, বসি।

প্রদীপ বসল, মুখ নীচু করে ঘাসের মধ্যে কি যেন খুঁজছিল সে। রজতের অবস্থাও একই রকম। সকলে অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচায়ি করছিল।

হঠাৎ হেসে উঠল প্রদীপ, খুক খুক করে চাপা হাসি, হাসতে হাসতে সহসা প্রাণখোলা হাসি দেখতে দেখতে রজতও হেসে উঠল, তারপর অনিকেত – দেখাদেখি ওরা চারজন – সমীর, শুভ্র, তাপস ও বিল্টু – ওরাও হাসতে শুরু করে দিলো কিছু না বুঝেই।

– তুই-ই বলে দে – অনিকে ঠেলা মেরে বলল প্রদীপ – সকলে খুব কৌতুহলী হয়ে রয়েছে।

– থাক্ না – মৃদুস্বরে প্রতিবাদ করল অনি।

– না, না, বলেই ফেল্, আমার আর কিছু মনে হচ্ছে না। তাছাড়া জানিস্ তো আমার কপালটাই এমনি। বিনা দোষে শুধু শুধু অপমানিত হই।

আবহাওয়া ক্রমশঃ উজ্জ্বল। অনি সংক্ষেপে ঘটনাটা বলে চলেছে, রজত পকেট থেকে দুটো সিগারেট বার করে একটা প্রদীপকে দিলো। লাইটার জ্বেলে এগিয়ে ধরল, বলল – সকলে ভাগাভাগি করে খেতে হবে কিন্তু –

সন্ধ্যা থেকে মেঘ জমছিল, আর এখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। চলে গেল শেষ ট্রেন, তার বাঁশির শব্দ সমস্ত গ্রামকে শুনিয়ে দিল বৃষ্টি ভেজা বাতাস, তারপর সব শুনসান, শুধু বৃষ্টি ও ঝিঁ ঝিঁর শব্দ আবহাওয়ার শীতল আমেজকে আরও গাঢ় করে তুলছিল।

মাঝখানে এ্যাসট্রে রেখে দুজনে দুপাশে আড় হয়ে শুয়ে নিঃশব্দে সিগারেটে টান দিচ্ছিল – প্রদীপ ও অনি, 'নাইটল্যাম্প'-এর মৃদু আলো ঘরে।

– শেষ ট্রেন চলে গেল – বাঁশির শব্দ মিলিয়ে যেতে অন্যমনস্ক ভাবে বলল অনি।

– আজকের মতো বল্ – প্রদীপ বলল।

– সে তো বটেই – হেসে উঠল অনি।

– হাসি নয়, সব শেষের পরে আবার শুরু আছে রে –

কেমন দার্শনিকের গলায় বলল প্রদীপ, – সেইরকম একটা কথা তোকে বলব বলে এসেছি, জানিস বলব বলব করেও বলে উঠতে পারছি না – সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ট্রেতে গুঁজে দিয়ে বলল প্রদীপ – আসলে গুছিয়ে বলার মতো অবসর হচ্ছিল না, বিকালবেলা আড্ডা আর সন্ধ্যে থেকে খাওয়া-দাওয়া আর গল্পগুজব – কিন্তু তোর ঘুম পাচ্ছে না তো? কি জানি বিরক্ত হবি কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না।

– তুই এমন করে বলছিস কেন – কিছুটা অবাক গলায় বলল অনি, মনে আঘাত লেগেছে তার – এমন যদি মনে হয় তাহলে এসেছিস কেন।

দুজনে চুপচাপ কিছুক্ষণ।

বসুন্ধরা রায় – মৃদু গলায় বিলম্বিত স্বরে উচ্চারণ করল প্রদীপ।

– কলেজের সেই বসুন্ধরা– ফার্স্ট ইয়ারের সেই মেয়েটার কথা বলছিস? যে তোকে চড়– না মানে–অপ্রতিভ ভাবে চুপ করে গেল অনি, কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠেছিল, আবার শুয়ে পড়ল।

– তোর লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই, অপমানের কপাল আমার, কারণে অকারণে ও তো লেগেই আছে, সেই ছোটবেলা থেকে অন্যের দোষ আমার ঘাড়ে চেপে কত যে মার খেয়েছি।

– তোর দোষ নেই বলিস না, আগুপিছু না ভেবে হঠাৎ হঠাৎ এমন এক একটা কাজ করে বসিস! তমাল তোকে চিঠিটা দিতে বলল আর তুইও অমনি –

– তমাল ওকে খুব ভালবেসেছিল রে –

– ছাই, অমন ভালবাসা ও মাসে একটা করে বাসতো, মেয়ে মানেই ওর কাছে প্রেম প্রেম, সহজভাবে কোনো মেয়ের সঙ্গে মিশতেই পারতো না। আমরা তো কত ছেলেমেয়ে একসঙ্গে আড্ডা দিয়েছি ঘুরে বেড়িয়েছি খেয়েছি-দেয়েছি আবার পড়াশোনাও করেছি –

– কিন্তু বসুন্ধরা তো কারো সঙ্গে মিশতো না।

– চুলোয় যাক্, সেসব তো সেই কলেজ লাইফের ব্যাপার, তারপর তো পাঁচ'ছ বছর কেটে গেছে।

– ওই জন্যেই তো বললাম – সব শেষের পর আবার শুরু আছে। ওই ঘটনার পর ও যখন কলেজ ছেড়ে দিলো তখন আমি যে কি 'রিলিফ' পেয়েছিলাম। তখন কি জানতাম এত বছর পর আবার দেখা হবে।

– কোথায় দেখা হলো? কবে? – উঠে বসে পড়ল অনি–

কেমন দেখতে হয়েছে ওকে? আগের থেকে আরও সুন্দর?

– সেই পুতুল পুতুল ভাব আর নেই রে, একটু যেন ঝরে গেছে, কিন্তু কি বলব কেমন তীক্ষ্ণ আরও উজ্জ্বল অথচ মনের দিক থেকে একেবারে উল্টো – সহজ, কোমল।

চুপচাপ কয়েকটি মুহূর্ত তারপর উদাস গলায় বলল প্রদীপ – অথচ তখন – কি ভুলটাই করেছিলাম – ওর পুতুল পুতুল চেহারার মতো ভেবেছিলাম মনটাও, তাই খুব সহজে চিঠিটা ওকে দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ও যে অমন বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠবে ভাবতেও পারি নি।

আবারও একটু থামল প্রদীপ, তারপর বলল – আর এখন তার ভাবের কথা কি বলব– কখনো বরষার মেঘ– কখনো শরতের আকাশ – কখনো বসন্তের বাতাস–

– এমনও হয়? – অবাক গলায় বলল অনি – কোথায় দেখা হলো? কি করে ভাব হলো?

ভাইঝি কমলিকাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য পরীক্ষা দিতে নিয়ে গিয়েছিল সে। বাড়ি থেকে অদূরে এই উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগটি সকালে। দুইপাশে দুটি ভবন মাঝখানের আঙিনা মাঠের মতো বড়। এই ভবনের নীচতলায় অফিসে নাম লিখিয়ে ওই ভবনে যেতে হবে লিখিত পরীক্ষায় বসতে।

এমনিতে ওদের একটু দেরি হয়েছিল। কমলিকাকে ওর মা নাকি বাবা নিয়ে যাবে এসব ঠিক করতে করতে শেষ পর্যন্ত কাকা। তারা যখন বিদ্যালয়ে পৌঁছাল তখন পরীক্ষা শুরুর মুখে। অতঃপর ব্যস্তভাবে তারা মাঠ পার হচ্ছিল।

ঠিক তখন ওপাশ থেকে মাঠ পেরিয়ে আসছে বসুন্ধরা। একেবারে মুখোমুখি হতে প্রদীপের বুকের মধ্যে ঘণ্টা বাজিয়ে ছুটে যায় দমকল বাহিনী ... পরক্ষণে থেমে যায় সমস্ত পৃথিবীর শব্দাবলী, এবং মুখ লুকিয়ে পলায়নে ব্যস্ত একদার পরাজিত অধীশ্বর... কিন্তু বিজেতার চোখে কি স্নিগ্ধ মায়া... মায়াবী ঠোঁটে কি অপরূপ হাসি... পরক্ষণে কেন ম্লান ছায়া নামে? ম্লান ছায়া মুছে নেয় হাসি?

মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত– তবু কত দীর্ঘ সময় যেন পেরিয়ে যায়... পদতলে শিকড়ের টান... তবু চলে যেতে হবে...

দুপক্ষ দুদিকে চলে যায়।

ঘরে পরীক্ষার্থীরা বসে গেছে, অভিভাবকেরা বাইরে ইতস্ততঃ দাঁড়িয়ে। একজন মধ্যবয়স্কা শিক্ষয়িত্রী দরজায় দাঁড়িয়ে এ্যাডমিট কার্ড দেখে কমলিকাকে ভেতরে যেতে দেন। প্রদীপ উঁকি দিয়ে দেখে – তখনও প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়নি, পায়ে পায়ে বারান্দায়– প্রান্তে এসে দাঁড়ায়।

... হয়তো মেয়েকে নিয়ে এসেছে পরীক্ষা দিতে... কেমন বিয়ে হয়েছে কে জানে! ... 'পরণে ঢাকাই শাড়ি কপালে সিঁদুর'... সে দৃশ্য কেমন...

মাঠ পেরিয়ে ফিরে আসছে মেয়ে, হাতে একগোছা কাগজ। ওগুলো কি প্রশ্নপত্র? ভাবতে ভাবতে মেয়ে এগিয়ে আসে কাছাকাছি। বারান্দার প্রান্তে যেখানে দাঁড়িয়েছে প্রদীপ সেখানেই মাঠে নেমেছে দুধাপ সিঁড়ি, এতএব সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসে,

উর্ধমুখে চেয়ে – যত দূর দেখা যায় সাদা সিঁথি – হ্যাঁ, হাতে প্রশ্নপত্রের গোছা। এ মেয়ে শিক্ষয়িত্রী।

আবারও হাসি।

হাসে প্রদীপ। এক শান্ত সায়র শীতল বাতাস কাঁপে বুকের ভিতর...।

– কার পরীক্ষা?

– ভাইঝির–

– আসছি –

আসছি! কি কথা! আমি যেন তোমার আসবার আশায় অনন্তকাল ধরে অপেক্ষায় আছি– ভাবল প্রদীপ– সত্যিই এমনই এক অনুভব বুকের মধ্যে... কিন্তু কেন? আমি তো কখনো ওকে ভালোবাসিনি, অথচ আজ কেন মনে হয় আমি এমনই দিনের অপেক্ষায় দীর্ঘকাল... কি এক আশ্চর্য অনুভবের ঘূর্ণিস্রোতে তলিয়ে যাচ্ছি অসহায় আমি...

– একটা কথা ছিল– খুবই মৃদু কণ্ঠস্বর।

– ক্-কি– চমকে উঠল প্রদীপ, খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে অপরূপা, একপলক তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল প্রদীপ।

– অনেক অ-নে-ক দিন মনে হয়েছে একদিন যদি দেখা হয়! – একটু চুপ, তারপর– আমাকে একটু সময় দেবেন কোনো একদিন, কোনোখানে–

কি কথা! আহা ভিখারিণী যেন! – ভাবল প্রদীপ, একটু স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করল, একজন মহিলা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, পাশ দিয়ে চলে গেল একজন, আড়চোখে তাকাল।

– আমি টেলিফোনে জানাব– মৃদু গলায় বলল প্রদীপ, নম্বর? – পকেট থেকে মোবাইল বার করে বলল প্রদীপ। মৃদু অথচ স্পষ্ট গলায় নম্বর বলে গেল মেয়েটি।

মন্থর পায়ে হেঁটে যায় মেয়ে ঘরের ভিতর... বাকি সময়টুকুতে এক পলকের জন্যও তাকে আর দেখতে পায় না প্রদীপ।

একদিন যায়... দুদিন যায়... তিনদিন যায়...

আবারও কি কোনো অপমান অপেক্ষা করে আছে আমার জন্য? – ভাবতে

ভাবতে কেটে যায় দিন– কাটে ঘুমহীন রাত। ... কিন্তু ওই হাসি ... ওই কণ্ঠস্বর ... ওই প্রার্থনার মতো কিছু কথা ...

চতুর্থ দিন কাঁপা কাঁপা আঙুলে মোবাইলের বোতাম টেপে অসহায় যুবক। তখন বিকেল চারটে বাজতে দশ মিনিট বাকি।

– বসুন্ধরা?

... কি বিলম্বিত সময়... বীজ রোপন ... অঙ্কুরোদগম... শিশু গাছ তরুবর হলো, তারপর ফুল ফোটে ...বলছি –

– আমি প্রদীপ। পরশু রবিবার এমন সময় শিবপুর লঞ্চঘাটে দেখা হবে?

– হবে।

দেখা হবে... দেখা হবে... দেখা হবে ... কথা হবে... কথা হবে... কথা হবে... বুকের মধ্যে সারাক্ষণ উসখুস উসখুস ... কি ছুঁয়েছে বুক? কোনো অজানা আলোকরশ্মি? নাকি কোনো অচিন বাতাস!

গাঢ় সবুজ রঙের একটা পাঞ্জাবী আছে তার খুবই প্রিয় – প্যান্ট সার্ট বাতিল করে ওটাই পরল আর সাদা পাজামা। একটা সাদা চটি আছে তার, সযত্নে তোলা থাকে, সেটা বার করে পরল। নির্দিষ্ট সময়ের একটু আগেই এসে দাঁড়াল সে, একা মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে!

একটা কথা বলবে। অবশ্যই সেটা প্রেমের কথা নয়। তবে কেন এত চঞ্চলতা, এত আবেগের ঢল বুক জুড়ে! ভাবতে ভাবতে বিষাদের কুয়াশা নামে, চারিদিক অদৃশ্য হয়ে যায়। – আমার কি দেরি হয়ে গেল? লাজুক লাজুক গলায় বলে বসুন্ধরা– তার চমক ভাঙে – সামনে দাঁড়িয়ে বাসন্তী রঙের সাজে বাসন্তিকা বসুন্ধরা। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল সে, বিষাদের আবরণ থেকে বেরিয়ে আসতে পারল না। এই অপরূপা শুধু অপরূপা নয়, গুণবতীও – স্বনির্ভর, স্বাবলম্বী। আর আমি? এক সঙ্গতীহীন নগন্য বেকার। আমার নাগালের অনেক দূরে ওর অবস্থান। দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে এগোলো সে।

– আমরা কোথায় যাবো? – হাসি ওর মুখে লেগেই আছে।

– লঞ্চে তো ওঠা যাক্ – একঝলক মুগ্ধ দৃষ্টি ছড়িয়ে বলল প্রদীপ, মৃদু হাসল। দুজন পাশাপাশি এগোল।

লঞ্চের একপ্রান্তে রেলিং ধরে দাঁড়াল দুজন। দক্ষিণ সাগর থেকে ছুটে আসছে দুরন্ত বাতাস গঙ্গার উজানে, এলোমেলো করে দিতে চায় পোষাক আসাক এবং মন।

ইডেন গার্ডেনের সবুজ ঘাসের পাশে বসল দুজন। প্রায় নিঝুম পরিবেশ। অস্তগামী সূর্যের আলো গাছেদের দীর্ঘ ছায়া ফেলে ছড়িয়ে আছে এখানে ওখানে।

দুবার চোখাচোখি ও চোখ সরিয়ে নেওয়া – তারপর – এতবছর পর কি যে বলব তাই ঠিক করতে পারছিনা – একটু চুপ – আমার অন্তরের কথা এতবছরেও আমি ভুলতে পারিনি।

– থাক্ না ওসব কথা –

– তাহলে বলুন আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

– কি আশ্চর্য, আবার ক্ষমা চাওয়া কেন, কম বয়সের কি সব ছেলেমানুষী – তাছাড়া 'আপনি' করে বলছ কেন? কলেজে তো সব তুই তোকারি করতাম।

– আমি তো কখনও অমনভাবে মিশতে পারিনি।

– কিন্তু এখন তো পারছ – হেসে ফেলল প্রদীপ।

– সে তো প্রাণের দায়ে।

– বাপ্‌রে! একেবারে প্রাণের দায়।

– নয় তো কি!

– শাস্তি তোমার এমনিতেই অনেক হয়েছিল। সারা কলেজের ছেলে মেয়ের ছিছিক্কার, কলেজ ছাড়িয়ে ছেড়েছিল তোমায়।

– তা মোটেই নয় মশাই। – প্রতিবাদ জানাল বসুন্ধরা, মুহূর্তে ওর ভেতরের তেজী মেয়েটি যেন উঁকি দিল, বলল – আমি নিজেই নিজের অপরাধের গ্লানি নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছি, ভেবেছি কলেজে আসতে যেতে চলতে ফিরতে কি করে আপনার –

– বাধা দিল প্রদীপ, – বলো তোমার –

উঁ! – কেমন এক মিষ্টি ভঙ্গীতে ঘাড় বাঁকাল বসুন্ধরা, মৃদু স্বরে বলল – কি করে ঐ মানুষটার মুখোমুখি হবো।

– মানুষটার না গাধাটার! আমি কি বোকা গাধার মতো কাজ করিনি?

– ছি ছি!

– সত্যি ছি ছি! ঠিকই বলেছ, এমন কাজ কেউ করে?

– আমি তা বলিনি, আমি বলছি নিজেকে কেউ অমন তুলনা করে?

... সূর্য ঢলে পড়ে, ... কথার পর কথা ... কত কথা, আজে কথা, বাজে কথা, ... ছায়া নামে ... আবছা আঁধার ... কথা থামে ... চুপচাপ বসে থাকে দুজনে পাশাপাশি...

তারপর –

– আবার কবে দেখা হবে? – খুব মৃদু কণ্ঠস্বর বসুন্ধরার, প্রায় শোনাই যায় না।

– সত্যি! – আবেগ প্লাবিত হয় প্রদীপ – এতো সৌভাগ্য।

– আহা!

– অনি।

– উঁ।

– ঘুম পাচ্ছে তোর।

– অনেক রাত হলো, কিন্তু ঘুম পাচ্ছে না।

– কতবার দেখা হলো, কত কথা হলো, মুখে কিছু না বললেও বুঝতে পারি ওর ভালোবাসা, আর আমার কথা কি বলব, বুঝতেই পারছিস কিন্তু –

– সমস্যাটা কি তাইতো বুঝতে পারলাম না।

– ও তো নিজের ভাবে নিজেই বিভোর, কোনো দিন আমাকে জিজ্ঞাসাও করল না আমি কি করি, কিভাবে থাকি – ভাবতে গেলে এত কষ্ট হয়! কবে যে চাকরি বাকরি পাবো কিছু ঠিক নেই। ওর কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবো সে কথা ভাবতেও পারি না। তাই মনে হচ্ছে ক্রমশঃ আমি ভীষণ এক অপমানের আবর্তের দিকে এগিয়ে চলেছি।

বৃষ্টি থেমে গেছে, মানপাতার ওপর কোথায় ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে, বিলম্বিত লয়ে শব্দ হচ্ছে টুপ্ ... টুপ্ ... টুপ্ ... ঘুম আসছে ...

– সমাধান তোর হাতেই আছে – ঘুম জড়ানো গলায় বলল অনি – আরেকবার ওর হাতে একটা চিঠি দে, অপরের নয় – তোর নিজের চিঠি।

নিগৃহীত

আমি যেদিন এখানে এসেছিলাম সেদিন খুব ঝড়, গেট দিয়ে ঢুকেই পথের ওপর বিশাল গাছটা হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল, দুজন লোক কুড়ুল চালিয়ে কেটে পথ পরিষ্কার করছিল, আমি এসেছিলাম –

আমি এসেছিলাম ? না তো, আমাকে আনা হয়েছিল। আমাকে এনেছিল বাসন্তী আর ওর দাদা – কি যেন নাম ? কি যেন... নাঃ, মনে পড়ছে না। তারপর নাকি দুবছর কেটে গেছে... রোজই আমি গাছটাকে দেখেছি ওই জানালা থেকে– পথের এপাশে এক অংশ ওপাশে আরেক অংশ– মধ্যে পথ– শয্যাশায়ী–না–শয্যাশায়ী কেন ? ধরাশায়ী বলতে হবে – তাই না ? ধরাশায়ী গাছটার পাতাগুলো ক্রমশ শুকিয়ে ঝরে পচে মাটিতে মিশিয়ে গেল, সরু সরু ডালপালাগুলো ক্রমশ শুকিয়ে খসে এখন মোটাসোটা গুঁড়ি এদিকে এক অংশ ওদিকে অন্য অংশ – মধ্যে কুড়ুলের ঘা– শুকিয়ে। আমি এখন রোজ বিকেলে এর ওপর এসে বসি। বাড়ির চারপাশের বাগানটায় ঘুরি– না তো ! আমাকে বাগানে ঘুরে বেড়াবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হলে এখানে গেটের কাছে এই গাছের শরীরের ওপর বসি।

গেটটার কোনো ফাঁকফোকর নেই। পুরো লোহার চাদর দিয়ে মোড়া। বাইরের কিছুই দেখা যায় না। দেখতে পেলে ভালো লাগত। আমার বাইরে যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু অনুমতি নেই। যদিও আমি এখন পুরোপুরি সুস্থ, কিন্তু যেহেতু বাসন্তী আমাকে এখানে এনে ভর্তি করে দিয়ে গেছে তাই একমাত্র সে নিতে এলেই আমি বাইরে যেতে পারব।

বাসন্তী আসে না, বাসন্তী আসবে না– আমি জানি। এই দুবছরে সে নাকি কোনোদিনই আসেনি, শুধু টাকা পাঠিয়েছে। শুনেছি এখন আর টাকাও পাঠায় না, প্রয়োজন নেই। আমি এখন পুরোপুরি সুস্থ। কিন্তু এখন আর বাসন্তীর কোনো খবর নেই। কর্তৃপক্ষ নাকি অনেকবার চিঠি পাঠিয়েছে, তার প্রতিলিপিও ফাইলবদ্ধ আছে কিন্তু – গত দুবছরের– দুবছরের হিসাব আমার নয় – এরা বলেন তাই – প্রথম দিকের বছর দেড়েকের কথা আমার বিশেষ কিছুই মনে পড়ে না। শুধু মাথার মধ্যে যন্ত্রণা আর এলোমেলো কিছু দৃশ্য – যেগুলি কোনো ঘটনা নয় – একই মানুষ – ডাক্তার, নার্স, ওষুধ, ইনজেকশন – এসবের মধ্যেই ঘুরপাক খেতে খেতে ক্রমশ চিন্তাশক্তির একটু একটু দানাবেঁধে ওঠা – কিন্তু সবকিছুর মধ্যেই এই ধরাশায়ী বৃক্ষের শরীর অবিচ্ছেদ্যভাবে গাঁথা রয়ে গেছে মস্তিষ্কে। ওই কুড়ুল চালানোর শব্দ আমি এখনও শুনতে পাই। আমি রোজ এই মৃত শরীরের ওপর এসে বসি, বিকালের নরম রোদ চারপাশে...

দুবছর আগের জীবন – যা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল ধারাবাহিকতা থেকে – এখন আমি জোড়া লাগাতে পারি – জোড়া লাগাতে পারি কি? না, তা কি করে পারব? এভাবে বলা যায় দুবছর আগের ওই জীবনের ঘটনাগুলি আমি মনে করত পারি এখন।

মুখে কিছু কথা – প্রতিবাদ উচ্চারণ না করতে পারলে মনের মধ্যে কথা বলা বেড়ে যায় – বিবিধ কথোপকথন – প্রতিপক্ষকে সামনে দাঁড় করিয়ে – সামনে? না তো, কল্পনায় প্রতিপক্ষকে সামনে রেখে বলা যেতে পারে – অজস্র প্রতিবাদ, যুক্তিজাল বিস্তার – আর এইসব কথা, কথা, কথা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে কি প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মস্তিষ্ক-যন্ত্রণা – এভাবে চলতে চলতে আমি সব খেই হারিয়ে ফেলেছিলাম।

অতএব অসুস্থ আমাকে বাসন্তী রেখে গিয়েছিল চিকিৎসার জন্য... এখন এই সুস্থ মস্তিষ্কে পুনরায় ফিরে আসতে চায় প্রতিবাদী কথাগুলি বাসন্তীর অদৃশ্য অবয়ব সামনে রেখে পুনরায় – কিন্তু না – আমাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে। ওসব চিন্তা একদম নয় শুভেন্দু... এইসব ঘাতকেরা চুপিসাড়ে ঢুকে পড়তে চায় তোমার মস্তিষ্কে, তোমাকে পীড়িত করতে চায়... এখন তুমি সুন্দর কোনো গানের কথা ও সুর ভাবো, গান করো শুভেন্দু – ওই তো ওই গানটা – ভরিয়া পরাণ শুনিতেছি গান, আসিবে আজি বন্ধু মোর... ভাবো, এমন কোনো সুন্দর প্রভাত আসবে যেদিন প্রিয় বন্ধু তোমাকে নিতে আসবে – সেজন বাসন্তী নয়, হয়তো অন্য কেউ, কিংবা এক পরিবর্তিত বাসন্তী – যে তোমাকে নিয়ে যাবে আনন্দের জগতে...

তুমি কি চাও দুবছর আগের সেই বাসন্তী – তারও আগে তিন বছরের সেই অসহ জীবন – সেই বাসন্তী তোমাকে নিতে আসবে – নিয়ে যাবে সেই ঘরে যেখানে পুনরায় অতিবাহিত হবে কোন জীবন? তবে কোন অপেক্ষায় থাকা শুভেন্দু?

...চিন্তাগুলি... ঘাতক চিন্তাগুলি ক্রমশ ঘিরে ধরতে চাইছে তোমাকে, কিন্তু না, তোমারে সুস্থ থাকতে হবে – ওদের সরাও... গান গাও শুভেন্দু... ভরিয়া পরাণ শুনিতেছি গান...

আমাকে দেখতে ভালো নয়। দেখতে ভালোর সীমারেখা কোথায়? আসলে এসব সীমারেখার কথা তারাই ভাবে যাদের দেখতে ভালো নয়। আমি জানি আমাকে দেখতে ভালো নয়। কিন্তু তাই বলে আমি তো ক্যালিবান নই! মাথার সামনের দিকের চুল আমার অল্প বয়স থেকেই ফাঁকা হয়ে গেছে। রঙ আমার কালো, কিন্তু

তাই বলে নিগ্রোদের মতো নয়। যদিও আমি একটু বেঁটের দিকে, কিন্তু বাঁটুলতো নই। যাইহোক, সব মিলয়ে আমি জানি আমি দেখতে ভালো নই। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যে বয়সে ছেলেরা নিজেকে নানাভাবে খুঁটিয়ে দেখে – বিভিন্ন ভঙ্গীতে চুল আঁচড়ে নিজেকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে চায় – সে বয়স থেকেই নিজেকে নিয়ে আয়নার সামনে আমি সময় দিইনি। ওই ফাঁকা ফাঁকা চুল আঁচড়াতে যতটুকু!

কিন্তু তবুও তো মানুষ স্বপ্ন নিয়ে বাঁচে! ভাবতাম একটা কিছু বিশেষত্ব আমার আছে – আমার গান – সেটাতে আমি আরও মনোনিবেশ করতাম। আর আছে একটা সরকারি চাকরি – খুব একটা সামান্য পদের নয়, আবার খুব উচ্চপদেও নয়। সব মিলিয়ে আমি একটা সাধারণ মানুষ। সাধারণ কোনো নারী আমাকে নিশ্চয় ভালোবাসবে। এভাবে আমি সুখের প্রতীক্ষায় ছিলাম এবং পরিবারের প্রতি আমার আনুগত্য – তোমরা যা দেখে দেবে ... আসলে আমি নিজের কাছেই অবিশ্বাসী ছিলাম – কাউকে দেখতে গেলে তো নিজেকে নিয়েই যেতে হবে। দেখতে যাওয়া মানেই দেখাতে যাওয়া!

দেখে এসে বাবা বলেছিল – আজকালকার দিনে এমন মেয়ে হয় না, মেয়েরাও আজকাল ছেলেকে দেখে নিতে, কথা বলে নিতে চায় – এ মেয়ে বাবা মাকে বলেছে – তোমরা যা দেখে দেবে – তারপর... বাসর ঘর? ফুলশয্যা? – ঘাতক চিন্তাগুলি সারাক্ষণ ঘিরে ঘিরে থাকে... আমি তাড়া দিলে সেগুলি সরে যায় ফেউয়ের মতন, পুনরায় ফিরে আসে চুপিসাড়ে...

কাঁটা ফুটিয়ে দেবার মানুষ সবসময় আছে! নাকি সত্যি কথাটা জানিয়ে দেওয়াই ভালো? বাসন্তীর বোন – অবন্তী – দিদির সঙ্গে সাপে নেউলে – চুপিচুপি জানিয়ে দিয়েছিল – দিদির সঙ্গে একজনের ভালোবাসা ছিল – সুন্দর দেখতে – তার সঙ্গে প্রেম চটে যেতে দিদি দেখাশোনার বিয়েতে মত দিয়েছে, বলেছে তোমরা যা দেখে দেবে! বলে হি হি করে হেসেছিল – এখন আপনাকে ওর পছন্দ হয়নি! বেশ হয়েছে! বড্ড দেমাক ছিল!

কিন্তু তবু মানুষ ঘরসংসার করে... পাশাপাশি অতিবাহিত করে জীবন... বিরক্ত মুখে সংক্ষিপ্ত কথায় দিন যায়... রাতের আঁধারে... জৈব তাড়নায় সাময়িক মিলিতও হয়... আবার আসে আনন্দহীন দিন...

সকালবেলা আমার খুব গান গাইতে ইচ্ছা করে। গান গাইলে মনটা খুব ভালো হয়ে যায়। এই হাসপাতালের চত্বরে কোনো বড়ো গাছ নেই, তাই পাখিও ডাকে

না। হয়তো এই গাছটা যখন দাঁড়িয়েছিল তখন পাখিও ছিল। আমার তিনতলার ফ্ল্যাটের পূবদিকে আছে ছোট একটু ব্যালকনি, সেখানে ঝুঁকে আছেএক কৃষ্ণচূড়া গাছ। ওই গাছে রোজ ভোরবেলা একটা পাখি গান গাইত। আমি তখন ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াতাম, পাখিকে দেখতে চাইতাম, কিন্তু ও যে কোথায় পাতার আড়ালে থাকত! কখনও মনে হতো গাছটাই বুঝি গান গাইছে।

ঘরে এসে আমি তানপুরা বাঁধতাম, তখন শুনতে পেতাম একরাশ বিরক্তি ঝরা কণ্ঠস্বর – আঃ, শুরু হলো ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ – মনটা তেতো হয়ে যেত, তবু গান শুরু করতাম, আস্তে আস্তে মনটা ভালো হয়ে যেত। একদিন দেখলাম তানপুরাটা ফাটা, হারমোনিয়ামের দুএকটা রীড ভাঙা।

সন্ধ্যা হয়ে এলো, হিম পড়ছে, ঘরে যাই। আজ মনে হয় ঘুম আসবে না। ... রাত নিঝুম, নিদ নাহি... নজরুলের গান। বড়ো ব্যথাতুর কবি। রাগ বেহাগ – গানটা গাইতে ইচ্ছা করছে খুব।

ভাবনাগুলি আগুনের গোলকের মতো – কোথা কোন অদৃশ্যলোক থেকে হঠাৎ ছুটে এসে মস্তিষ্কে আঘাত করে, ছিন্নভিন্ন করে দেয় স্নায়ু। দুঃসহ সব ঘটনা প্রবাহ কিছুই ভোলা যায় না। এভাবেই অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলাম। দুঃসহ ঘটনাপ্রবাহের দহন যখন মস্তিষ্ক আর সহ্য করতে পারত না তখন মাথার মধ্যে কোথায় যেন ঝলক দিত বিদ্যুতের মতো কিছু – একটা অন্ধকার ঘরের দরজা খুলে যেত, অচেতন না হয়েও আমি কেমন হারিয়ে যেতাম বিস্মৃতির অতলে, তখন আর কোনো যন্ত্রণা নেই। সেই তো ছিল ভালো। সুস্থ হয়ে পুনরায় ফিরে আসে ঘাতক চিন্তাগুলি। অসীমদার সেইসব বাক্যবাণ – হ্যাঁ, মনে পড়েছে বাসন্তীর দাদার নামটা – উনি মাঝে মাঝে আসতেন, ভুরিভোজন করতেন, তারপর বোনের সঙ্গে গুলতানি – বাবা যে কি একটা দেখে দিল তোকে!

বোন বলত – তুমিও তো ছিলে।

– আহাহা, আমি কী আর দেখতে গিয়েছিলাম। সত্যি, এইটুকু ফ্ল্যাটে তোকে মানায়? একটু বড়সড় ডাইনিং টেবিল পাতারও জায়গা নেই।

– আসলে তোমরা আমাকে কোনোরকমে কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছিলে – (বলতে বলতে ফোঁপানি)

– আহাহা, কাঁদিস না, আর আমাকে জড়াস না। বাবা তোকে কোথাও গছিয়ে

দিয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছিল। আমাদের মত নিয়েছিল নাকি! একবার দেখতেও নিয়ে যায় নি। পয়সাওলা হলেও না হয় কথা ছিল! টাকা পয়সা গাড়ি বাড়িতে অনেক দোষত্রুটি চাপা পড়ে যায়।

– বলো! তুমিই বলো! আমার বন্ধু নন্দিতা – ওই যে গো –

– হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনি, বলনা –

– নন্দিতাও একদিন বরের সঙ্গে মারুতি গাড়ি নিজে চালিয়ে হাজির, বলে কিনা গাড়িটা কিনলুম, তো ভাবলুম বাসন্তীদের নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি, চল্ –

– কোথায় গেলি?

– মাথা খারাপ তোমার? আমি ওই লোকটাকে নিয়ে কোথাও যাই? হুঁঃ!

– বাসন্তী কোনোদিন আমার সঙ্গে কোথাও বেড়াতে যায়নি... এমনকি অসুস্থতার সময়ও নয়। অসুস্থতার শুরুতে বিরক্ত হয়ে মাঝে মাঝে দাদাকে টেলিফোনে ডাকত, দাদা আমাকে স্পেশালিস্ট ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া শুরু করে। তারপর আর অফিসেও যেতে পারতাম না... ঘরটাকে মনে হত একটা অন্ধকার কূপ। চারিদিক দুলে দুলে উঠত। কেমন গোলমাল হয়ে যেত সব... চেনা মনুষকে অচেনা মনে হত।

এরমধ্যে অবন্তীর আসা ছিল বৃষ্টিভেজা একরাশ বাতাসের মতো। হঠাৎ এক একটা ছুটির দিনে চলে আসত। অবশ্য সেটা আমার অসুস্থতার আগের কথা। সকালের দিকে আসত, বলত – চলুন ক্যালিবান, বাজার যাই। তাড়া দিত, হাত ধরে টানাটানি করত। দেরি হলে রাগ দেখিয়ে বলত – কী লোক রে? ওঠ্ ওঠ্ বলছি। বুঝতাম এগুলি সবই ওর অভিনয়। এসব করে ও দিদির জ্বলুনি বাড়াতে চাইছে। কিন্তু তবু তো ভালো লাগে। তাই আরও দেরি করতাম। ও তখন কাতুকুতু দিত, অনেক দিন পর আমি হাসতাম।

রাস্তায় বেরিয়ে একদিন বলেছিল – এই যে মশাই, ক্যালিবান কার নাম জানেন? বলেছিলাম – অতটা মুখ্যু না হয় নাই বা ভাবলে।

– মুখ্যু কেন? শিক্ষিত সবাই কি আর সাহিত্য পড়ে?

– অল্পস্বল্প পড়েছি।

– ওই নামে ডাকলে রাগ হয় না?

– আদর করে ডাকলে সব খারাপ গালাগালিও মিষ্টি লাগে।

– এই যে মশাই, অত না, একটু মিষ্টি ব্যবহার করি বলে ভাববেন না কিন্তু ঢলে পড়েছি।

– তা কেন ভাবব, আমি বুঝি এসবই করো তুমি দিদিকে জ্বালাতে। তাছাড়া আমার কী আছে, যা দিয়ে নারীর মন হরণ করা যায়!

– ও রে! এ ক্যালিবানের দেখছি বুদ্ধিশুদ্ধি অনেক।

– তোমার ওই কবিই বোধহয় বলেছেন – নামে কি আসে যায়! তোমায় যদি অবন্তী না বলে বুলবুলি বলে ডাকি –

– ডাকিস না একবার দিদির সামনে! ওঃ! সত্যি ডাকবি তো? ব্যাপারটা দারুন হবে! ডাকলে তোকে একটা চু- দেবো।

– তাহলে ডাকব না।

– ও মা! এত সতীপণা!

আসলে ও কমবয়সী মেয়ে, ছেলে মেয়ে সব বন্ধুর সঙ্গে তুই তোকারি করে কথা বলে, ফাজলামি গালাগালিও করে, সেটাই আমার ওপর একটু ঝালিয়ে নিত।

বাজারের পাশে ডালপুরীর দোকান, দুজনে ডালপুরী খেতাম। ও একটা একটা করে ডালপুরী নিত, আর আরেকটু তরকারি দাও, দাও, বলে দোকানদারকে জ্বালাত।

বাজার থেকে এসে নিজে রান্না করত। রান্নাঘরের সামনে আমাকে বসিয়ে দিত আলু পেঁয়াজ রসুন কুটতে। কখনও বলত – ডুমো ডুমো করে বেগুনটা আগে কেটে দিন, ভেজে রাখি।

... ভাবতে ভাবতে মনটা ভালো হয়ে গেল। কিন্তু না, এরপরও তো আছে। বাসন্তী একদিন প্রচণ্ড ঝগড়া করল, শেষে বলল – আদিখ্যেতা! খবরদার আর কোনোদিন আমার বাড়ি ঢুকবি না, ঢুকলে ঝাঁটা পেটা করব, বেরিয়ে যা, এখুনি বেরিয়ে যা।

সেদিন ওকে না খেয়েই চলে যেতে হয়েছিল। আসলে সেদিন ও আমার গানের খুব প্রশংসা করছিল। আমাকে বসিয়ে একের পর এক গান শুনছিল। খুব তারিফ করছিল। হয়তো মিথ্যে, তবু এত ভালো লাগছিল।

পরদিনই দেখলাম তানপুরাটা ভাঙা। ভেঙে যায় সুরের বাগান!

বড় অসহায় অবস্থার মধ্যে আছি। এরা আমাকে রাখতে চায় না, অথচ কেউ আমাকে নিয়েও যায় না। অবশ্য যে রোগীকে ভর্তি করে যায় সুস্থ হওয়ার পর তার

কাছেই ফিরিয়ে দেবার নিয়ম, কিন্তু সে তো আসে না। তাছাড়া আর কে বা আমাকে নিয়ে যাবার আছে। ঘরে ফিরলে আমি আবার চাকরিতে যোগ দিতে পারি। জানি না চাকরিটা কী অবস্থায় আছে! আমাকে যোগ দিতে দেবে কিনা। অবশ্য না দেওয়ার কিছু নেই। এরা যখন সুস্থতার সার্টিফিকেট দিচ্ছে তখন চাকরি ফিরে পাবো না কেন? সরকারি চাকরি অত সহজে যায় না। ফিরতে হবে। অসহ হলেও সেই ঘরেই ফিরতে হবে। এত কিছুর পরে বাসন্তী কি একটুও বদলাবে না? কিন্তু বদলালো আর কই? তাহলে তো নিতেই আসতো। আসলে ও আমার সঙ্গে হয়ত আর সম্পর্ক রাখতে চায় না। কিন্তু ওর চলছে কি করে? একা থাকতে গেলেও তো টাকা লাগে। নাকি পেয়ে গেছে মনের মানুষ? নাকি বাপের বাড়িতে আছে? কাউকে চিঠি লিখব? কোনো বন্ধুকে? মা বাবা কেউ একজনও যদি বেঁচে থাকতেন। কোনো বন্ধুর ঠিকানা জানা নেই। উত্তর পাড়ায় থাকে বিশ্বনাথ। আগে আমাদের পুরোনো পাড়ায় থাকত, তারপর আমার মতোই ফ্ল্যাট কিনেছে। ও গেছে সেই উত্তর পাড়ায়, কিন্তু ঠিকানা জানি না। ও ছিল আমার প্রিয় বন্ধু। দিদি থাকে বর্ধমানে। কি যেন নাম গ্রামটার – মনে পড়ে না।

সবাই হারিয়ে যায়... কেউ খোঁজ রাখে না...

আমিও হারিয়ে গেছি... কেউ খুঁজে দেখে না... কে কার জন্যইবা ভাবে! আমিও তো নিজের জন্যই ভাবছি!

চিন্তা – তারপর চিন্তা – তারপরেও চিন্তা! চিন্তা নিয়েই আছি। চিন্তা ছাড়া আর কি বা আমি করতে পারি! এবং চিন্তা থেকে উত্তেজনা –

ডাক্তারবাবু বলেছেন যখনই এলোমেলো চিন্তা আমাকে বিপর্যস্ত করতে চাইবে তখন যেন আমি একশ থেকে উল্টোদিকে গুনতে থাকি, এভাবে আমি চিন্তামুক্ত হয়ে যেতে পারব।

কিংবা কোনো সুন্দর দৃশ্য – যেখানে হয়ত আমি একদিন বেড়াতে গিয়েছিলাম – খুব ভালো লেগেছিল – তেমন দৃশ্যের কথা – সেই বেড়ানোর আনন্দের কথা ভাবি।

কিংবা কোনো সুখের ঘটনা – সুখের কথা, আনন্দের কথা যেগুলি স্মৃতিতে আছে তেমন কিছু ভাবনা –

জীবনে কোথায়ই বা আমি বেড়াতে গিয়েছি! একবার বন্ধুদের সঙ্গে ঘাটশিলা গিয়েছিলাম তখন কলেজে পড়ি। কলেজের এক বন্ধুর দাদুর একটা বাড়ি ছিল

সুবর্ণরেখা নদীর কাছে। ছোট একতলা বাড়িটার জানালা দিয়ে দেখা যেত সুবর্ণরেখা নদী, তার ওপারে পাহাড়, ছোট সবুজ পাহাড়। তার উপর নীল আকাশ। ওই একটা জায়গায় বেড়ানোর কথা ভাবতে গিয়ে দেখি কত কিছুই খুঁটিয়ে মনে পড়ে যায়। আশ্চর্য লাগে, এত কিছু কোথায় থাকে মনের মধ্যে! তখন শীতকাল, প্রায় শুকনো নদীর মাঝখান দিয়ে তির তির করে বয়ে চলেছে স্বচ্ছ জল, ছোট ছোট মাছেরা খেলা করছে... সোনালী বালুর কী অপরূপ রঙ! তারই মাঝে কোথাও বা বসে আছে বিরাট একটা পাথর... কোনোটা ধূসর, কেনোটা লালচে... একটা পাথরের ওপর আমি উঠে বসতাম, মনে হত রাজ সিংহাসন...

সত্যি ডাক্তারবাবু, আপনার এই ওযুধটা খুব ভালো। মনটা কি দারুণ ভালো হয়ে যায়!

চিন্তা যদি সুখের হয় সেতো আমার পক্ষে ভালো, এমন যদি হয় – এই যে এখানে বসে আছি – সামনে ওই গেট – কে যেন ডাকছে – সিকিউরিটি গেট খুলে দিল, এগিয়ে আসছে অবন্তী – দুপা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল – অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে – আমি এগিয়ে গেলাম, দেখলাম ওর চোখে জল, ফিস্ ফিস্ করে বলল – তুমি কত রোগা হয়ে গিয়েছ ক্যালিবান!

ওর তো বাঙ্গালোর না কোথায় পড়তে যাওয়ার কথা ছিল। যেদিন ও শেষবার এসেছিল সেদিন বাজার যেতে যেতে অমনই কি যেন বলছিল। ও বোধহয় জানে না। জানলে নিশ্চয় একবার অন্তত দেখতে আসত।

কিন্তু ও কি? ওইতো গেট খুলছে সিকিউরিটি, ওই তো এগিয়ে আসছে অবন্তী! আমি কি স্বপ্নের মধ্যে আছি? দুপা এগিয়ে ও থমকে দাঁড়াল, আমি এগিয়ে গেলাম, দেখলাম ক্ষোভে দুঃখে বিচলিত এক অপরূপ মুখ। ফিসফিস করে ও বলল – তুমি কত রোগা হয়ে গেছ ক্যালিবান। উঃ এত নিষ্ঠুর দিদি। এমনটা পারল? একটু চুপ করে থেকে বলল – আমি বাঙ্গালোর চলে গিয়েছিলাম পড়তে, সপ্তাহখানেক হল এসেছি, অনেক কিছু শুনলাম। কি করেছে জান দিদি? তোমার অফিসে তোমার অসুস্থতার কাগজপত্র দেখিয়ে দরখাস্ত করে তোমার চাকরিটা বাগিয়ে নিয়েছে। ওর কোনো সঙ্গতি নেই, তার ওপর অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসার খরচ – এইসব আবেদন করে চাকরিটা পেয়েছে, আর এসব কাজে উঠে পড়ে লেগে সহযোগিতা করেছে আমাদের দাদা।

অবন্তীর কথাগুলি একসঙ্গে অনুধাবন করতে পারছিলাম না, আমার পা কাঁপছিল, পড়ে যেতে যেতে কোনোক্রমে সামলে নিলাম, অবন্তী আমার বাহু ধরে ফেলেছিল।

– কেউ ভালো করে কিছু বলতে চায় না। বউদিকে জেরা করে সব কথা বার করেছি – বলতে বলতে রাগে উত্তেজনায় অবন্তীর মুখ রক্তিম, ও এত স্বার্থপর, এত নীচ যে জন্য ওকে সহ্য করতে পারতাম না, কিন্তু এখন শুধু অসহ্য নয় ঘেন্নাও করছে, ভীষণ ঘেন্না করছে।

– একটু স্থির হও অবন্তী, একটু শান্ত হও।

– কী করে শান্ত হই? আমার বাড়ির লোকেরাও কি অদ্ভুত! দিদি আপনার কোনো খোঁজ নেয় না অথচ ফূর্তি করে বেড়াচ্ছে জেনেও চুপচাপ বসে আছে, নিজেরাও তো একটা খবর নিতে পারত?

– তুমিও ওদের মতোই থাকতে পারতে! – অতি কষ্টে বললাম আমি।

– এ্যাই, এ্যাই – ধমকে উঠল অবন্তী।

– ও এখন কোথায় আছে? – আরও কষ্টে জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

– কষ্ট পাবেন না, আমি জানি আপনি দিদিকে ভালোবাসেন, কিন্তু ও শয়তানী, এখন অনেক টাকা মাইনে পাচ্ছে, পুরোনো প্রেমিককে পায়ের তলায় এনে ফেলেছে। তার সঙ্গেই কোথায় থাকে যেন।

– আমার ফ্ল্যাট?

– সেখানে খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম, তালাবন্ধ পড়ে আছে। পাশের ফ্ল্যাটের লোকেরা বলল – অনেকদিন ওরকম পড়ে।

... মাথার মধ্যে কোথায় যেন খুলে যাচ্ছে অন্ধকারের দরজা, ... আমি চলে যাচ্ছি ওই অন্ধকারে... কিন্তু না, আমি যেতে চাই না, চাই না...

– কি হলো? – সামান্য ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল অবন্তী, আমি ফিরলাম।

– অফিসটা কোন দিকে? – জিজ্ঞাসা করল অবন্তী। আমি হাত তুলে দেখিয়ে দিলাম।

...তবু ভালোবাসা ছিল বুকের ভেতর... আর ছিল আশার আলো। খুবই ক্ষীণ তবু ছিল। কেন ভালোবাসি? ও চিরকাল আমায় অবজ্ঞা করেছে, তবে? আসলে আমার বুকের মধ্যে ভালোবাসার একটা ফাঁকা ঘর ছিল... আমার সে ঘর বহু যতন করে ধুয়ে, মুছে, আসন পেতে, বরণমালা সাজিয়ে সাগ্রহে প্রতীক্ষায় ছিলাম... আমারে যে জাগতে হবে, কি জানি সে আসবে কবে এই নিরালায়... বাসন্তী এলো, বরণ করে নিলাম...

কিন্তু তারপর...

কি নিঃস্ব আমি এখন! কী করব? কোথায় যাব? বেঁচে থাকা কি অর্থহীন!

অবন্তী আসছে, ও কি চলে যাবে? যাবেই তো!

– আমাকে ফেলে চলে যেও না অবন্তী, – আমি হাহাকার করে উঠলাম – যেভাবে হোক আমায় মুক্ত করে দাও!

– আমি সেজন্যেই এসেছি ক্যালিবান, আমি তোমার বন্ধু। সব জানিয়ে দরখাস্ত করে নিজে মুচলেকা দিয়ে, আরও বিধিনিষেধ মেনে তুমি মুক্ত হতে পারবে। তারজন্য কয়েকদিন সময় লাগবে। তারপর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার ফ্ল্যাটের তালা ভেঙে ফেলতেও পারবে, কিন্তু তারপর?

– তাই তো! তারপর? তারপর কী জানি না –

– আমি জানি – অবন্তী বলল – তারপরও তুমি ভাঙতে পারবে না সম্পর্ক, আশার প্রদীপ জ্বেলে অপেক্ষা করবে।

পরশমণি

এখন রাত্রি গভীর, চারিদিক নিঝুম, এখন ডব্লিউ বি ইউ থ্রি থ্রি এইট থ্রি বাসের কন্ডাকটর, তোমার ঘুমিয়ে পড়া উচিত, অনেক ভোরে উঠেছ, সারাদিন অনেক পরিশ্রম, আবার আগমীকাল খাটুনি আছে হে – এসব কথা সে মনেমনে বলছিল আর ঘুমোতে চেষ্টা করছিল।

আজকের ফার্স্ট ট্রিপ থেকে ডিউটি শুরু হয়েছে – ফার্স্ট বাস ছাড়ে পাঁচটা দশ'এ। সুতরাং তাকে আরও ভোরে উঠতে হয়েছিল। তারপর সারাদিনের এই পাশবিক পরিশ্রম। ওদিকে ফার্স্ট বাস দিয়ে ট্রিপ শুরু করলে এদিকে একটু তাড়াতাড়ি শেষ হয়। আজকে তার কাজ শেষ হয়েছে সন্ধ্যা ছটায়, অথচ তারপরই আশ্চর্য সংযত ভাবে সে বাড়ি চলে এসেছে। আজকে বারোশো বাহাত্তর বাসের ড্রাইভার দলজিৎ সিং তাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। বলেছিল, আরে গুরু আজকে তো তোমার ট্রিপ তাড়াতাড়ি শেষ হচ্ছে, তো দিলবাহারের হোটেলে চলে এসো, পরশু একটা পার্টি নিয়ে হামি দীঘা গিয়েছিলো তো খড়্গপুরমে এক দোস্ত বহুত আচ্ছা এক দিশি মাল দিয়েছে। শালা জংলী লোকেদের অসলি মাল একদম আগুন কা মাফিক... অথচ সে সোজা বাড়ি চলে এলো, তার বুকে জামার ভেতর ঘামে ভেজা জবজবে গেঞ্জির নীচে যেন একটা পোকা ঢুকে পড়েছে। সেটা হাঁটহাঁটি করছিল আর সে যেন সেটাকে বারবার সরিয়ে দিতে চাইছিল। কিন্তু পোকাটা গেঞ্জির নীচে নয় – আরও ভেতরে কোথায় হাঁটাচলা করছিল।

আজ সকালে তখন অফিস টাইম – বাসের গেটে উপচে পড়া লোক – সে রড ধরে ঝুলছিল আর চিৎকার করছিল ডালহৌসি–ধর্মতলা স্পেশাল – তখন বাসটা সেই স্টপেজে দাঁড়াল। সেই স্টপেজের নাম চাঁপাতলা, সেখানে অপেক্ষারত যাত্রী মহিলা পুরুষ – সে সিঁড়িতে উঠে দাঁড়িয়েছে, দু-একজন উঠতে উঠতে বাস চলতে শুরু করেছে এবং ঠিক তখন – ঠিক তখন মেয়েটি কোনক্রমে একটা পা কোথায় যেন দিয়েছিল কি না – হ্যান্ডেলে হাত রেখেছিল কি না এমন অবস্থায় চলন্ত বাস থেকে পড়ে যাচ্ছিল – অসহায় – সে বলিষ্ঠ হাতে তার কোমর জড়িয়ে তুলে নিলো। হয়তো পাদানির সেই ঝুলে থাকা লোকগুলোর হাত উদগ্রীব হয়েছিল এই উপকার করবার জন্য, কিন্তু সে এই রকম করলো, অসহায় মেয়েটির হাত তার কাঁধের কাছে আঁকড়ে ধরেছিল কয়েক মুহূর্ত, আর সে এক আশ্চর্য মুখ দেখছিল। তার রঙ ঈষৎ শ্যামবর্ণ, তার তীক্ষ্ণ নাক, তার দীঘল চোখের বিব্রত পল্লব – কপালে আর ঠোঁটের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম, সে দীর্ঘাঙ্গী এবং সুদেহিনী। সব কিছুর স্থায়িত্ব কয়েক মুহূর্ত, সব অনুভূতিগুলি কি তার মনের মধ্যে বিশ্লেষিত হয়েছিল? না, কিন্তু

এইসব অবস্থার মধ্যে চোখে চোখ রাখা কয়েক মুহূর্ত তার মধ্যে কে যেন একটা স্রোত এনেছিল। মেয়েটি সামনেই লেডিজ্ সীটে বসে মুখ ফিরিয়েছে বাইরের দিকে, সে তার পেলব গ্রীবার ওপর দৃষ্টি রেখে অসহায়ের মতো অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক মনে হয় মেয়েটির পরিচিত – বলেছিলেন, 'এই অফিস টাইমে এরকম রিস্ক নিয়ে বাসে উঠে কোথায় যাচ্ছ তুমি? একটু আগে কি পরে যেতে হয়।'

– 'আমি– আমি অফিস যাচ্ছি।'

– 'সে কি? কোথায় চাকরি? কতদিন' –

– 'এই সবে কয়েকদিন।'

(... কতদিন আমি কত মেয়ের গায়ে গা দিয়েছি–চাপ দিয়েছি, বুকের ছোঁয়া নিয়েছি, নানা ভাবে, আর খিদে কার না শরীরে আছে, বলো? এই যে কি বুড়ো কি জোয়ান লোকগুলো লেডিজ্ সীটের সামনে লোভীর মতো ভিড় করে – দেখলে মনে হয় শালা ঠাসা কলার কাঁদি যেন, দাদা স্যার দাদু হাজার বলেও তাদের গা নাড়ানো যায় না, তা তাদের ছোঁক ছোঁকানি যেমন – আমারও তেমন, এ হচ্ছে একটা ছোঁয়া ছোঁয়া খেলা, কিছুই না তবু এ একটা আমেজ, যেমন ঠাণ্ডায় আগুন তাপ ভালো লাগে কিংবা বোশেখ মাসে গরমে হঠাৎ বৃষ্টি... কিন্তু এ যেন অন্যরকম কিছু।) সে কেমন অসহায় বোধ করছিল, একটা দীর্ঘ গভীর ঘুম যখন আস্তে আস্তে সরে যায় – তখন সমস্ত শরীরে কেমন একটা নিঝুম ভাব ছড়িয়ে থাকে, তখন গা কেমন অবশ মনে হয়, শরীরটা যেমন নিজের নয়, কিংবা খুব ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেলে যেমন একটা দুর্বলতা সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ে তেমন কিছু অনুভূতি তাকে জড়াচ্ছিল, সে অন্যমনস্ক ভাবে আশে পাশে টিকিট কাটছিল, কিন্তু চিৎকার করা দূরে থাকুক বাস থামা কিংবা লোকের ওঠানামা সম্পর্কেই অবহিত ছিল না। অফিস টাইমে ভর্তি বাস তীব্র গতিতে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

হাওড়া স্টেশনে এলে বাসের ভিড় একটু পাতলা হলো এবং বাস যখন ডালহৌসি স্কোয়ার পার হলো তখন বাসে শুধু বসে থাকা যাত্রী, দু-একটি সীট খালি। সে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, মেয়েটির কাছে সে টিকিট চাইতে পারেনি, অথচ সে দেখতে পাচ্ছিল মেয়েটি হাতে টাকা রেখেছে। মিশন রো পেরিয়ে গেলে মেয়েটি উঠে দাঁড়াল, সে ঘণ্টা বাজাল, মেয়েটি একটু ইতস্ততঃ করল তারপর কেমন একটা সঙ্কোচ জড়ানো পায়ে নেমে গেল। বাস যখন পুনরায় চলতে শুরু

করল – তার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল একবার দেখে, কিন্তু আভাসে সে দেখেছে মেয়েটি এদিকেই হাঁটছে, সুতরাং তাকে দেখতে পাচ্ছে, এখন তার মনে সঙ্কোচ লাগছিল এই ভেবে যে তাকালে মেয়েটি ভাবতে পারে হ্যাংলার মতো তার শরীরের দিকে সে তাকাচ্ছে। (...উঃ, আমার আবার সতীপণা! সতী হলি কবে? না লাঙ্ মরল যবে! আমি শালা মেয়েছেলে দেখলেই মুখ চোমরাই আমার আবার হঠাৎ একি হোলরে? বলে রাখালি, কত খেলাই দেখালি...।) সে নিজেকে খুব একচোট গালাগালি দিল মনেমনে। আসলে সে নিজের দুর্বলতা অস্বীকার করতে চাইছিল নিজের কাছেই, সে ছটফট করছিল, ধর্মতলায় পৌঁছে সে পর পর দু ভাঁড় চা খেল, সিগারেটে এতো তীব্র টান দিল যে সিগারেটের আগুন ফুলকি ছিটিয়ে উঠল।

রাত সাড়ে নটায় সে কোনদিন বাড়ি আসে না, একটু আগে ট্রিপ শেষ হলে দেলবাহারের হোটেল – সেখানে চা সিগারেট, আড্ডা, নোংরা কথার ফুলঝুরি কিংবা রাজাউজীর মারা, কোনোদিন একটু আধটু মাল খাওয়ায় দলজিৎ – সঙ্গে দিলবাহারের ঝাল ঝাল মাংসের দামটা সে দেয়, আর যেদিন ট্রিপ শেষ হতে আরও রাত হয় সেদিন কোনক্রমে ক্লান্ত শরীর টেনে হিঁচড়ে ঘরে এনে প্রায় ঢুলতে ঢুলতে রুটি চিবানো – বোনটা সামনে দেওয়ালে হেলান দিয়ে ঘুম চোখে বসে থাকে। আজ বাড়ি এসে সে দেখল হ্যারিকেনের আলোয় ভাইটা বিজবিজ করে পড়ে চলেছে আর বোন তার কাছে গালে হাত দিয়ে ঢুলছে, দোরে মা আঁচল বিছিয়ে শুয়েছিল অন্ধকারে আর ঘরে বাবার নাক ডাকছিল।

বাড়ি সম্পর্কে তার মতামত এই রকম :::ঃ টাকা টাকা করে শালা সবাই আমাকে খাবলাচ্ছে, যেন আমার গা টাকার আঁশ দিয়ে মোড়া। আর এই শালা টিন মিস্ত্রি বাপ – সারাজীবন নিজে বালতি কলে কাজ করে কাটালো এখন আর খাটতে পারে না ছেলের কাঁধে আছে – এ শালার সাধ অনেক, ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবে। আমি বাবা অত বোকা নই, পেরেছো ক্লাস এইটের বেশি ঠেলতে? টিন মিস্ত্রির ব্যাটা বাস কন্ডাক্টর হয়েছি। এখন পড়েছে মেজ ছেলে আর ছোট মেয়েকে নিয়ে, কিন্তু এখন তো বাবা নিজের গাঁটে টাকা নেই, যা ছিল বস্তির মধ্যে এই দেড়কাঠা জমিতে টালির চালের রাজপ্রাসাদ তুলে ফেলেছো, তা এখন তোমার দুই ছেলেমেয়ের হুদো হুদো পড়ার খরচ কে জোগাবে? এক তো এই পাঁচটা প্রাণীর পেটের খোরাকই কত!

গতকাল রাত্রে একটা বিরাট ঝগড়া চেঁচামেচি। রোজই বোনটা তাকে রাতে খেতে দেয়, ঘুম ঘুম চোখে এটা ওটা ওলোট-পালোট করে, সারাদিনের ক্লান্তির

ওপর এতে তার মেজাজ আরও খারাপ হয়, কাল রাতে খেতে দিয়ে সে বলল দাদা আমার পরীক্ষার ফি জমা দিতে হবে, আর মাইনেও বাকি পড়েছে কিছু। সে রুটি চিবানো বন্ধ করে বলল, তুই কী পরীক্ষা দিবি? – কেন তুমি জানোনা, আমার তো হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা আর তিন মাস বাকি – কত টাকা? – প্রায় চারশো টাকার মতো লাগবে – সে রুটির থালা ফেলে চিৎকার করে উঠল, শালা আমাকে সব কী পেয়েছে রে? আমি কি টাকার গাছ, নাড়া দিলেই পড়বে? বলে চারশো টাকা দাও! যেন ক্যাশিয়ার রেখে দিয়েছে যখনই চাইছে দাও, যখনই চাইছে দাও, সে ভীষণ চিৎকার করছিল, বাড়ির সবাই জেগে উঠেছিল কিন্তু কেউ কথা বলছিল না, বোনটা কাঁদছিল, বলছিল – তুমি খেয়ে নাও, তুমি খেয়ে নাও। কিন্তু সে না খেয়েই শুয়ে পড়েছিল।

আজ ঘরে এলে মা তাড়াতাড়ি উঠে বসল, বলল, শরীর খারাপ নাকি? সে বলল, না। তারপর অসম্ভব রকম ঘামে ভেজা গন্ধ নোংরা জামাপ্যান্ট খুলে দোরে দড়িতে টাঙিয়ে দিল। সে কোনরকমে বালতির জলে হাতমুখ ধোয়, কোনরকমে খায় তারপর শুয়ে পড়ে। আজ সে রাস্তার টিউবওয়েলে গিয়ে ভালো করে গা ধুলো তারপর ঘরে এসে বলল, পাজামাটামা কিছু কাচা আছে? বোন সাবানে কাচা একটা পাজামা দিল। তারপর অন্ধকারে সে একাকী, তার শরীরের ওপর কি যেন এক প্রশান্তি বিছানো ছিলো আর বুকের নীচে কোথায় একটা পোকা চলাফেরা করছিল, শিরশির করছিল। তার পরিবারের প্রত্যেকের মুখ তার আশেপাশে ভাসছিল, আর তাদের প্রত্যেকের জন্য তার বুকে কেমন একটা মমতা একটা মায়া মাখামাখি হয়ে যাচ্ছিল।... তার বৃদ্ধ বাবা, আহা মানুষটার সাধ তার ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখুক, ভদ্র সম্মানীয় জীবিকা নিয়ে বাঁচুক, পাঁচজনের কাছে সম্মানিত হোক, তার নিজের জীবনটা যাহোক তাহোক ভাবে কাটল। তার মা, শীর্ণ শরীর শান্ত মানুষটা সবতাতেই যেন তার ভয়, দেখলে মনে হয় যেন সারা জীবন কখনো সে ভাল করে খায়নি, সর্বদা তার চোখ দুটি কি করুণ, উদয়াস্ত সংসারের জন্য খাটতে খাটতে সে তার জীবন ফুরিয়ে দিল। তার ভাই, বেচারী কোনোদিন মুখ ফুটে টাকাপয়সা চাইলো না, দুবেলা টিউশনি করে কলেজের খরচা চালায়, তার মধ্যে কখনও নেহাৎ আটকালো তো মায়ের কাছে বলবে অনেক সঙ্কোচে। আর এই বোনটুকু, কিবা বয়স, বেচারীর এখনও পুতুল খেলার সাধ হয়তো মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করে, অথচ সে চার হাতে সংসারের কাজ সামলাচ্ছে। সাবান কাচতে কাচতেই তার হাতদুটো ক্ষয়ে গেল। ওর খুব গান গাওয়ার ইচ্ছে, আপন মনে সে

যখন গান গায় তার মধুর কণ্ঠস্বর সত্যিই শোনার মতো, অন্ততঃ যদি ওকে একটা সস্তার হারমোনিয়াম কিনে দেওয়া যেত – নিজের চেষ্টাতেই হয়তো অনেক এগিয়ে যেত। গত রাতের কান্নাভেজা চোখের কথা মনে হলো তার। ব্যথা লাগল, সকলের জন্য তার মনে ব্যথা লাগল, বাবার জন্য মায়ের জন্য ভায়ের জন্য, বোনের জন্য, তার কেমন ইচ্ছা হচ্ছিল সকলের মাঝখানে বসে সকলের সঙ্গে খুব আন্তরিক ভাবে কিছু কথা বলে।...

এক সময় সে উঠল। সারাদিন অদ্ভুত একটা ঘোরের মধ্যে কেটেছে, দুপুর একটার হোটেলের ভাত, বিকালে চা বিস্কুটও জোটেনি আজকে, খুব খিদে পেয়েছে, পাশের ঘরে ওরা তখনও পড়ছে, বোনকে ডাকল, বলল, খেতে দিবি? যেন খেতে দেওয়া না দেওয়া তার বোনের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। খেতে বসে ঝোলের বাটিতে রুটির টুকরো ডুবিয়ে সে বলল, 'কি ব্যাপার রে একটা গোটা ডিম দিয়েছিস আমাকে?' সে এতো সহজ আর আন্তরিক ভাবে কথা বলছিল যে মনে হলো তার কণ্ঠস্বরে কি যেন ছলছল করে উঠল। তার বোন কেমন অবাক আর খুশী খুশী হয়ে উঠল, বলল, 'বারে! জানোনা তুমি যে মুর্শিদাবাদ থেকে দুটো মুরগীর ছানা এনেছিলে সে দুটো তো বড় হয়েছে – ডিম দিচ্ছে কদিন ধরে – অনেকগুলো ডিম জমে গেছে তাই আজ আমাদের গ্রান্ড খাওয়া!' কথা বলতে বলতে তার চোখ দুটি খুশীতে ঝলমল করছিল, সেদিকে এক পলক তাকিয়ে সে আস্তে আস্তে বলল, ক'দিনের মধ্যে তোর টাকা জমা দিতে হবে রে? বোন মুখটা নীচু করে নিলো, বলল এক সপ্তা মাত্র সময় আছে। এরপর নিঃশব্দে সে খাওয়া শেষ করল, হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা তোর একটা হারমোনিয়ামের খুব সখ না?' বোন এমন চমকে তাকাল! তাড়াতাড়ি জলের গ্লাস শূন্য করে সে উঠে পড়ল, সে জানেনা কেন তার চোখ ভিজে উঠল।

তারপর গভীর রাত্রি – নিঝুম – সে নিজেকে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করছিল।

একদিন দুদিন তিনদিন ... দশ দিন আশায় আশায় কাটলো তার। কিসের আশা? শুধুমাত্র একটু দেখা! সে এতো উদগ্রীব হয়ে রইল। প্রত্যহ কাজের শেষে একটা হতাশা তাকে গ্রাস করে। কোনদিন আগে কোনদিন পরে পার হচ্ছে সে সেই আকাঙ্খিত পথের মোড়। নির্ধারিত সময় আর আসে না, অথবা কখন সে চলে যায়, এই আগ্রহ এই উদগ্রীব সময় তার মনকে আরও দ্রবীভূত করছিল, একটা অস্থিরতা একটা চাঞ্চল্য সর্বদা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছিল। তারপর একদিন ... সেদিন এক রাজনৈতিক নেতা নিহত হয়েছেন, চারিদিকে যানবাহন বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল,

হাওড়া স্টেশনে সে যখন বাস নিয়ে পৌঁছাল যখন সন্ধ্যা সাতটা, স্ট্যান্ডে একটিও বাস নেই, বেশিরভাগ স্ট্যান্ডেই বাস ছিল না, অথচ অজস্র মানুষ অপেক্ষারত, এবং যারা অনভ্যস্ত তারা দিশেহারা, এমন অবস্থায় যা হয় ... বাসের লোকগুলি নামনে নামতে কয়েক শত মহিলা পুরুষ প্রায় যুদ্ধ করছিল, সহসা সে তাকে দেখল ... কোনক্রমে উঠে পড়েছে, বসল, বাসের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সে তাকে দেখছিল, ক্লান্ত মুখ, ঈষৎ শুকনো ঠোঁট, কপালের কাছে কিছু রুক্ষ চুল, কালো ব্যাগটি বুকের কাছে একহাতে আঁকড়ে ধরে সে বসেছিল, দৃষ্টি যেন উদাস জানলার বাইরে ছড়ানো, সহসা কি যে হলো ... এত গোলমাল ব্যস্ততা কিছুই অনুভূত হচ্ছিল না, সে যেন কোনো নির্জন প্রান্তর অথবা নদীতীরে দাঁড়িয়েছিল তার আকাঙ্খিতার মুখের দিকে তাকিয়ে।

বাসে উঠে লোকেরা এখন চিৎকার করছিল ... এই কন্ডাকটার বাস ছাড়ো না, আর কোথায় লোক তুলবে বাবা... কেউ টিং টিং করে ঘণ্টা বাজিয়েই চলেছিল, একজন তাকে ধমক দিয়ে উঠল ... 'কি হে কথা কানে যাচ্ছে না, বাসটা ছাড়বে তো, যত্তো সব ওয়ার্থলেস্!' আরেকজন সায় দিল আর বলবেন না মশাই ... (এরা আমাকে মানুষ ভাবে না, এইটুকু মান সম্মানও আমার এদের কাছে নেই, এরা সারাক্ষণ আমার সঙ্গে এই ভাষায় এই গলায় কথা বলে, কখনও কখনও আরও খারাপ ভাবে, এখন যখন বাস নেই অথচ এতো লোক তখন তোমরা বাপু উঠে পড়েছ কোনরকমে বলেই বাস্, ঝামেলা শেষ, এখন শুধু তোমরা বাড়ি পৌঁছলেই হলো, আর সবাই ফালতু! কথা শুনলে টেনে টেনে এক একটা থাপ্পড় লাগাতে ইচ্ছা করে, আর আমার হাতের একটা থাপ্পড় খেলে মাথা তুলতে হবে না হে।) ... সাধারণতঃ সে চিৎকার করে, ঝগড়া করে, প্রতিবাদ করে এবং অশ্লীল কথা আওড়ায়, তার মাথায় রক্ত চন্‌চন্ করে ওঠে, কিন্তু ইদানীং সে কিছুটা উদাস, যেন কিছুতেই কিছু এসে যায় না, সুতরাং সে চুপচাপ যত জনকে পারল তুলে নিল, অনেক গালাগালি খেয়েও মহিলাদের উঠতে সাহায্য করল, তারপর নির্বিকার ভাবে বাস ছাড়ার সঙ্কেত জানাল। এটাই শেষ ট্রিপ আজকের, সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাস দ্রুত গতিতে ছুটছিল আর তার বুকের স্পন্দন দ্রুততর হচ্ছিল, সেই ক্লান্ত অন্যমনস্ক সুন্দর মুখটুকু সে ফিরে ফিরে দেখছিল বারবার।

আজকে অনেক ক্ষতি হলো, সবে সাড়ে আটটা বাজে – ছুটি। অনেক দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, শুধু নিতাইদার সেলুনটা খোলা, কে একজন দাড়ি কামাচ্ছে, সে নিজের গালে একটু হাত বোলাল তারপর সেলুনে ঢুকে পড়ল, আয়নার সামনে

বসে সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মুখ দেখছিল (... আচ্ছা আমি কি দেখতে খারাপ? আচ্ছা আমার কি প্রেমের গল্পে হিরো হওয়ার মতো কোন যোগ্যতা নেই?) সে তার চওড়া কব্জি দেখছিল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, এতো বড় ডায়ালের ঘড়ি, চওড়া ব্যান্ড, এমন সময় – 'আছে আছে তোর ভালোই আছে!' সে চমকে উঠল, নিতাইদা কথাটা বলে হাসছিল। সে একটু ম্লান হাসল, বলল, 'এই শালার গাধার খাটুনিতে কদিন আর সুস্থ থাকবো বলো।' নিতাইদা তার গালে সাবান লাগাচ্ছিল – 'এ শালার কাজ ভাল্লাগে না, শালা কেউ মানুষই মনে করেনা। আর ঐ শালা দামু বুড়ো, টাকা দিয়ে বাস কিনেছে বলেই বাস্, ঘরে বসে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আর আমরা শালা খেটে খেটে মরে যাচ্ছি – ও শালার ভুঁড়িটা আমিই ফাঁসাবো একদিন।'

'বেশি ছটফট করিসনি', খুর চালাতে চালাতে বলল নিতাইদা। খানিকক্ষণ চুপচাপ 'নিজের বেশ একটা ট্যাক্সি থাকত! নিজে চালাব, আমার খুব ইচ্ছা করে জানো, এই শালা ফাটা কপালের নিকুচি' –

'আঃ!' নিতাইদা ধমক দিল। চিবুকের ডান দিকে ছোট্ট রক্তবিন্দু ফুটে উঠল 'তুই একটা পাগল, এরকম করে, যা না ব্যাঙ্ক ফ্যাঙ্ক তো আজকাল টাকা দিচ্ছে, চেষ্টা করে দেখগে যা না।'

সেই একটা সার্কাসের গল্প আছে না... তারের ওপর ব্যালেন্সের খেলা দেখাত একটি মেয়ে, তা একদিন অন্যমনস্কভাবে পড়ে যাওয়ায় দর্শকদের অনেকে হাসছিল, তাই দেখে জোকার তাকে খুব বকল আর দর্শকদের উদ্দেশ্য করে বলল আপনারা কিছু ভাববেন না, আর যদি কোনদিন ও পড়ে যায় তাহলে ওকে এই গাধাটার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেব, গাধা সেই থেকে আশায় আশায় আছে ... 'আমি শালা সেই গাধাটার থেকেও যা তা' সে অন্যমনস্ক ভাবে বলল। সে ঘরে ফিরছিল। আগামীকাল হরতাল ঘোষণা করে একটি ছোট মিছিল যাচ্ছিল।

পরদিন সকালে যখন তার ঘুম ভাঙল তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে, জানালার পাশে পেয়ারা গাছের পাতায় নরম রোদ্দুর ঝিলমিল করছিল, পেয়ারা তলায় বসে বোন বাসন মাজছিল। বিছানায় উপুড় হয়ে ঘাড় তুলে সে ডাকল, 'এই মান্তু।' বেশ হাসিহাসি মুখে তার দিকে তাকালে সে বলল, 'তুই এখনও পড়তে বসিসনি, উঁ?'

– 'আহা কাজগুলো তাই বলে করতে হবেনা বুঝি?'

– 'হবেতো! তাহলে আমার টাকাগুলো জলে গেল।'

– 'কক্ষনো বাজে কথা বলবে না।'

–সে খুব হাসছিল, 'আমার মুরগী দুটো কোথায় রে?'

– 'ওমা, তাইতো, ওদের তো ছাড়া হয়নি', বালতির জলে হাত দুটো একটু ধুয়ে নিয়েই ছুটলো। ওদিকে কোথায় যেন খাঁচা খুলে দেওয়া মাত্র সাদা ধপধপে মুরগী দুটো ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল, দুহাতে দুটো ডিম নিয়ে বোন ওকে দেখাল আর ঘাড় কাত করে হাসল।

(... তুমি কি জানতে না এ রকম একটা কিছু মুখোমুখি কোনো একদিন তোমাকে দেখতে হবে? সুতরাং তোমার আলবাল করার কিছু নেই, তুমি ডব্লিউ বি ইউ থ্রি থ্রি এইট থ্রি বাসের কন্ডাক্টার, তোমার ডিউটি ভালো করে করো হে, দেখো একটা টিকিটও যেন ফাঁকি না যায়...) তখন সন্ধ্যাকাল, হাওড়া স্টেশনের বাসস্ট্যান্ডে তার বাস দাঁড়িয়েছিল, সামনের বাস এখনও ছাড়েনি, এমন সময় সে দেখল মেয়েটি আসছে, সঙ্গে শান্ত চেহারার একটি যুবক কথা বলতে বলতে আসছিল, তারা বাসে উঠল, মেয়েটি বসল যুবকটি সামনে দাঁড়াল, তারা কি যেন কথাবার্তা বলছিল কিছুই তার কানে আসছিল না, সে শুধু দেখছিল তার কথা বলার ভঙ্গিমা, তার চোখের চাওয়া, রুক্ষ উড়ন্ত চুল, ঠোঁটের ভাঁজ চিবুক গ্রীবা সুষ্ঠু বুক নমনীয় হাত দুটি – সে আস্তে আস্তে চোখ সরিয়ে নিল, তারপর যতটা সম্ভব নিজেকে আড়াল করে টিকিট কাটতে লাগল। যুবকটি পকেটে হাত দিয়েছিল – মেয়েটি ব্যাগ খুলল, যুবক বলল, থাকনা আমি কাটছি।

– না না আপনি কেন কাটবেন? আমি – সে ব্যাগ থেকে পয়সা বার করল এবং তাকাল, শুধু এক পলকের বেশি সে মেয়েটির চোখে চোখ রাখতে পারল না, সে বুঝতে পারছিল নিজের মুখ খুব শুকনো আর ম্লান হয়ে গেছে, এই কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে যুবক তার হাতে একটি পঞ্চাশের নোট গুঁজে দিল। মেয়েটি তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছিল বাইরের দিকে, একবার চোখ তুলে সেদিকে তাকিয়ে সে একটি ছোট নিঃশ্বাস ফেলল ... আমি তোমাকে ভালোবাসি, সে মনে মনে বলল, এমন ভালোবাসা কেউ তোমাকে দিতে পারবেনা! না! না!

সে ওধার থেকে পার্টনারকে ডাকল এপাশে আসার জন্য, নিজে ওপাশে চলে গেল।

রাত্রে কাজ শেষে যখন সে বাড়ি ফিরছিল তখন সে ভীষণ ক্লান্ত, এমন অসহ ক্লান্তি কোনোদিন সে অনুভব করেনি। বাড়ি এসে সে দেখে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বোন

দোরে চুপচাপ বসে আছে, মা আঁচল বিছিয়ে শুয়ে। শব্দ পাওয়ামাত্র মান্তু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, বলল, 'জান দাদা আমাদের মুরগী দুটো মরে গেছে। সকাল থেকে কিছু খাচ্ছিল না আর কেমন করছিল।' কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সে বোনের মাথায় হাত রাখল, বলল, মনে হচ্ছে তুইও কিছু খাসনি, উঁ? হ্যারিকেন নিয়ে বোনের সঙ্গে সে মুরগীর খাঁচার কাছে গেল, ধবধবে সাদা মৃতদেহ দুটির ওপর কম্পিত হাত রাখল।

পেয়ারা তলায় অনেক পরিশ্রমে সে গভীর গর্ত করল, মৃতদেহ দুটি সযত্নে মাটি চাপা দিল, তার বুক থেকে তীব্র এক বেদনাবোধ ঠেলে উঠছিল, গুঁড়ো গুঁড়ো মাটি দুহাতে মুঠো করে সে হু হু করে কেঁদে ফেলল। হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় মা বাবা ভাই বোন তার চারপাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল।

দুখী

[এক]

একদিন আমি তোমার সামনে নতজানু হব, বলব মহুয়া অমন নিষ্ঠুর হাসি আর হেসোনা।

তুমি যখন সামনে আসো আমার সুবর্ণরেখা নদীর কথা মনে পড়ে। নদী যেখানে জলপ্রপাত একদা সেখানে আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম। পাহাড় জোড়া সেই শান্ত বনভূমিতে আমি যখন পৌঁছালাম তখন এক নিরবিচ্ছিন্ন গুঞ্জনধ্বনি বাতাসে। গাছগাছালির গভীর জটলার মধ্যে দিয়ে ধাপে ধাপে নেমে গেছে পথ। সেই নির্জন বনভূমিতে সেই আশ্চর্য পথের মুখে দাঁড়িয়ে আমার বুকে দ্রিম দ্রিম শব্দ ...

... তারপর আমি নামছিলাম আর নামছিলাম। অনেকক্ষণ ধরে। কখনো ডাইনে বাঁক কখনো বামে এবং গাছেরা আরও নিবিড়। আমি যতই নামছিলাম গুঞ্জনধ্বনি তীব্রতর হচ্ছিল, এবং একসময় তা গভীর গর্জন। পাহাড়ের দেওয়ালে দেওয়ালে সেই গর্জন প্রতিধ্বনিত হয়ে আরও উত্তাল হয়ে উঠছিল। প্রতি মুহূর্তে আমার বুকের দাপাদাপি বাড়ছিল, আমার মনে হচ্ছিল এখনই আমি এক অত্যাশ্চার্য দৃশ্যের মুখোমুখি দাঁড়াব। এভাবে চলতে চলতে এক সময় তার মুখোমুখি। ... আমি আত্মবিস্মৃত দাঁড়িয়েছিলাম, সুক্ষ্ম জলকণা আমার মুখে চোখে পোষাকেআসাকে ঝরে পড়ছিল, আমি নিজেকে পরিপূর্ণ তার কাছে সঁপে দিয়েছিলাম...।

মহুয়া তুমি জান না তুমি সামনে এলে আমার চারপাশে জেগে ওঠে নির্জন বনভূমি আর বুকের ভেতর সেই সব অনুভূতি। তখন আমার নিজের ওপর আর কোনো দখল থাকে না। মহুয়া, মুখোমুখি তুমি উচ্ছ্বল হাসো আমি ক্রমশঃ গভীর বিষন্নতায় ডুবে যাই। আমি বুঝতে পারি তুমি জেনে ফেলেছ আমার দুর্বলতা। তখন আমি খুব দুখী হয়ে যাই। মনে মনে বলি, মহুয়া, তুমি বুঝতে পার না অমি তোমাকে কত গভীর ভালোবাসি...।

তীব্র হর্ণ বাজিয়ে ব্রেক কষল একটা সবুজ রঙের বাস। হেডলাইটের ঝলকে তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। মুখ ফিরিয়ে সে দৃষ্টি ঠিক করতে চাইল। ব্যাগ কাঁধে কন্ডাক্টর ভাঁজ করা একটা কাগজ হাতে বাস থেকে নামল, তার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল গুমটির দিকে। সে খুঁটিয়ে দেখতে চাইল কন্ডাক্টরের মুখ, এদিকে ঝুঁকে পড়ে বাসের নম্বর দেখল – হ্যাঁ এইতো নম্বর মিলছে। তার হাতে বাসের একটা টিকিট ছিল, টিকিটে ছাপা বাসের নম্বরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখল – হ্যাঁ এই বাস। সে পেছন ফিরল, কন্ডাক্টর সময় লেখাচ্ছে।

আজ সকালে অফিস যাওয়া সময় সে যখন বাসে টিকিট কাটবার জন্য পয়সা খুঁজল দেখল মানিব্যাগে খুচরো পয়সা তো নেইই, খুচরো টাকাও নেই। সাধারণতঃ যা হয় – এই ভিড়ের সময় ব্যস্ত কন্ডাক্টরকে একশ টাকার নোট দিলে ভীষণ বিরক্ত সূচক কিছু কথাবার্তা শুনতে হয় এবং সেই সব অস্বস্তিকর পরিস্থিতির কথা ভাবতে ভাবতে সে একটা একশ টাকার নোট বার করল। কন্ডাক্টর কিন্তু স্বাভাবিকভাবে তাকে খুচরো পয়সা সমেত টিকিট দিল এবং বলল ন'টাকা পরে দিচ্ছি। ব্যাপারটা সুস্থজনক হওয়ায় সে স্বস্তিবোধ করল ও সম্মতি জানাল।

এরপর বাস চলছিল ভিড় বাড়ছিল এবং বাসের গুঞ্জন ঝাঁকুনি ও যাত্রীদের কথাবার্তা এসব থেকে ক্রমশঃ সরে গিয়ে সে নিজের মধ্যে... ইদানিং প্রায়শ এরকম হয়ে যায় ... অন্য মনে ভাবনা মনের মধ্যে নিজের ইচ্ছামতো গুছিয়ে বসে ... সে জানতেও পারে না ... নানাবিধ সংলাপ চলে নিঃশব্দে ... অভিমান, অভিযোগ কিংবা খুনসুটি ... মহুয়ার নাকছাবির পাথর ঘুরে ঘুরে ঝিলিক দেয়...

এভাবে কখন রাস্তা ফুরিয়ে যায়। ডালহৌসি স্কোয়ারে বাস পৌঁছে যখন ভিড় সরে যায় তখন সে আবার বাসের মধ্যে ফিরে আসে, অবসাদগ্রস্তের মতো দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, ত্রস্তে নেমে পড়ে। দ্রুত পা চালায় অফিসের দিকে।

ব্যাপারটা তার খেয়াল হলো টিফিনের সময়। মানিব্যাগ খুলে সে দেখল খুচরো কটা পয়সা এবং একটা টিকিট। পাশে দাঁড়িয়েছিল নীতিশদা, বলল, কি হলো রমেন? সে মুখচুণ করে বলল, ভীষণ ভুল হয়ে গেছে, কন্ডাক্টরকে একশ টাকার নোট দিয়েছিলাম, খুচরো পয়সা দিয়েছিল, টাকাটা বলেছিল পরে দেবে – আর দেয়নি।

– আর দেয়নি? টাকাটা তো তোমার? তুমি তো চেয়ে নেবে? কথাটা ঠিক করে বলো, – তুমি নাওনি, তা না বলে বলছ কন্ডাক্টর দেয়নি! নীতিশদা গজ্‌গজ্ করে, তারপর ক্যান্টিনের কাউন্টারে পয়সা দিয়ে দেয়।

ডিপার্টমেন্টে ফিরে এসে নীতিশদার হৈ হৈ। সব ব্যাপরেই তিনি যেরকম চেঁচামেচি করেন সেভাবে গলা তুলে সকলকে ডেকে – শুনেছ অমুক শুনেছ তমুক আজকে রমেন্দ্রনারায়ণ কি করিয়াছেন... সে লজ্জায় এতটুকু হয়ে যাচ্ছিল, নব্বই টাকার চাইতে তখন তার এই পরিস্থিতি চাপা দেওয়ার জন্য যদি নীতিশদাকে ন'শো টাকা দিতে হয় সে ভাবছিল দিতে পারে। কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমশই আরও জটিল হচ্ছিল এবং সে খুব অসহায়বোধ করছিল, নিজেকে মনে হচ্ছিল খুব দুখী।

... আঃ! বুকের ভেতরে আমার এক অলস পাখি বাসা বেঁধেছে। যতবার পাখিটাকে তাড়া দিয়ে খোঁচা দিয়ে বাসা থেকে হিঁচড়ে বার করে দিই আবার কখন চুপিচুপি সে ঠিক ঢুকে পড়ে, গুটিশুটি হয়ে বসে এবং পুনরায় উত্তাপ সঞ্চালন... তখন সব কিছু ভুল হয়ে যায়... এভাবেই চলছে ... আমি কিছুতেই পেরে উঠিনা, শুধুই হেরে যাই...।

হেরে যাওয়া দুঃখ তাকে আরও দুখী করছিল। তার চারপাশে সকলে যখন মুখর সে ক্রমশ কোনো এক গহ্বরে ঢুকে পড়ছিল।

একসময়ে নীতিশদা বললেন – তোমাদের ওখান থেকে তো প্রাইভেট বাস ছাড়ে?

সে হ্যাঁ বললে নীতিশদা বললেন, কই টিকিট দেখি?

– টিকিটটা? – সে মানিব্যাগ বার করল, খুলে খুঁজল টুঁজল কিন্তু টিকিটটা নেই! – ওটাতো ফেলে দিলাম মনে হচ্ছে, সে মৃদু গলায় বলল।

– ফেলে দিলে? কোথায়?

– বোধহয় ক্যান্টিনে।

নীতিশদা চুক করে একটা বিচিত্র শব্দ করলেন, বললেন, যাও খুঁজে নিয়ে এসো।

অতঃপর সে ডিপার্টমেন্ট থেকে বেরুল। কিছুই ভালো লাগছিল না তথাপি লিফটের কাছে এলো, সুইচ টিপল। ঊর্ধ্বমুখী লাল তীরের আলো জ্বলল আঙুলের পাশে, সে অন্যমনস্কভাবে তীরের আলোয় আঙুল বোলাল।

ক্যান্টিনে ঢুকে দেখল মেঝে ঝাঁট দেওয়া হচ্ছে। যেন সাতরাজার ধন মাণিক হারিয়েছে এভাবে সে ছুটে গেল কাউন্টারের কাছে এবং দেখল হ্যাঁ মেঝেতে একটা বাসের টিকিট পড়ে আছে। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে সে আর লিফ্‌টের জন্য দাঁড়াতে পারল না, দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একেবারে ডিপার্টমেন্টে এস যেন বিশ্বজয় করে এলো এভাবে টিকিটটা এগিয়ে দিল নীতিশদার দিকে।

– এই তো টিকিটে বাসের নম্বর রয়েছে – নীতিশদা যেন 'আর্কিমিডিস' – 'ইউরেকা ইউরেকা' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন, টিকিটটা ওর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, এটা রেখে দাও, বাড়ি ফেরার সময় সোজা তোমাদের বাস টার্মিনাসে চলে যাবে,

দেখবে এই নম্বরের বাস আছে কিনা, যদি না থাকে গুমটির 'টাইমকিপার'কে জিজ্ঞাসা করবে যে এই নম্বরের বাস কখন ফিরবে, ওরা তোমায় মোটামুটি বলে দিতে পারবে, বাসটা ফিরলে কন্ডাক্টরকে ধরবে, মনে হয় টাকা ফেরৎ পেয়ে যাবে।

কন্ডাক্টর ফিরে দাঁড়িয়েছে, সে কিছু বলতে চাইল কিন্তু কেমন একটা সঙ্কোচ আর অস্বস্তি তাকে পেয়ে বসল – নাঃ। ফিরে যাই, যাকগে কটা টাকা, এখন যদি কন্ডাক্টর অস্বীকার করে? – এরকম ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কভাবে ঘড়ি দেখল সে – আটটা দশ – গুমটির লোকটি বলেছিল ঐ বাস আটটা পাঁচে ফেরার কথা, কিন্তু সে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ এখন – আমার দ্বারা কিস্যু হবেনা – আমি একটা – সে হতাশভাবে ঘাড় নাড়ল। কন্ডাক্টর তাকে অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ গুমটির জানালা থেকে টাইমকিপার মুখ বাড়াল – ও মশাই! এইযে শুনছেন? আপনি তো তখন আঠাশ'শ পঞ্চাশের খোঁজ করছিলেন না? আপনারই তো টাকা ফেরত নেননি?

কন্ডাক্টর দাঁড়িয়ে পড়েছে। সে একবার কন্ডাক্টরের দিকে তাকাল, একবার 'টাইমকিপারের' দিকে, তারপর ঢোক গিলে বলল, – হ্যাঁ কন্ডাক্টর আপনাকে আমি একশ টাকার নোট দিয়েছিলাম – তার কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল, যেন কন্ডাক্টর তাকে ধমক দেবে।

– হ্যাঁ, আপনি কখন নেমে গেছেন, আমি আপনাকে খুঁজলাম, – বলতে বলতে কন্ডাক্টর ব্যাগ থেকে টাকা বার করছিল।

এখন সে খুব প্রফুল্ল। সিগারেটের দোকানে গিয়ে দাঁড়াল, পঞ্চাশ টাকা এগিয়ে দিয়ে বলল এক প্যাকেট ফিল্টার উইলস্। সে খুব কম সিগারেট খায়, সে জন্য প্যাকেট কেনার দরকার হয় না, কিন্তু এখন সে মেজাজে প্যাকেট কিনল, সিগারেট ধরালো।

ধীরে সুস্থে এদিক ওদিক তাকিয়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় ঘাড় তুলে দেখল কয়েকটি ছেলে ফেস্টুন টাঙাচ্ছে। সে একটু চমকে উঠল ... পুজো এসে গেল ... একটা বছর চলে গেল – ভাবতে ভাবতে রাস্তা পেরুল সে। এক বছর আগের আমি আর আজকের আমি? মহুয়া শুনছ? আমি তোমাকে ভালোবাসি। মহুয়া–আমি–তোমাকে –ভালোবাসি – এভাবে মনে মনে ধীরে ধীরে বলল সে – কিন্তু তোমাকে ভালোবাসতে গিয়ে আমি ক্রমশঃ আরও দুখী হয়ে যাই...

মুখ নীচু করে সে খুব ধীর পায়ে হাঁটছিল, তথাপি ভাঙা একটা গর্তে বৃষ্টির জল

জমে আছে – তাতে পা পড়তে পড়তে সামলে নিল। পাজামা সামান্য গুটিয়ে জল ডিঙিয়ে গেল তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে এদিক ওদিক দেখল।

... বাঁদিকের এই রাস্তা ধরে মহুয়াদের বাড়ি চলে যাওয়া যায়। কতক্ষণ লাগবে? দুমিনিট! কিন্তু? এক বছরেও আমি এটুকু রাস্তা অতিক্রম করতে পারিনি। আচ্ছা এখন যদি এরকম হয় মহুয়া কোথাও গিয়েছিল এখন ফিরছে – সে পিছু ফিরে তাকাল, যেন সত্যি মহুয়া ফিরছে! হতাশভাবে ঘাড়ের চুলে আঙুল ডুবিয়ে ঈষৎ ঝাঁকুনি দিল তারপর রাস্তা বাঁদিক রেখে সোজা হাঁটতে থাকল।

... মহুয়া কতদিন তোমাকে দেখিনি! মহুয়া, জানো, আমার এরকম মনে হয় সারাক্ষণ আমি এক তীক্ষ্নধার অস্ত্র বহন করছি বুকের মধ্যে। সারাক্ষণ অতি সাবধানে! যে কোনো মুহূর্তের অসাবধানতায় রক্তক্ষরণ হয়ে যায়। কি যন্ত্রণা! মহুয়া তুমি অমন কেন? একদিন আমি তোমার সামনে নতজানু হব, বলব, মহুয়া তুমি অমন নিষ্ঠুর হোয়োনা।

[দুই]

ঘটনাটা ঘটেছিল এরকম ঃ

বিজয়া দশমীর পরদিন সে সকালের দিকে মাসীমার বাড়ি যাচ্ছিল। পুজো প্যান্ডেলের সামনে পল্টু বিকাশ আর মধু তিনজন জটলা করছিল, এমন সময় পল্টু হাঁক দেয় এই রমেন কোথায় চললি?

– মাসীমার বাড়ি।

– বাহবা! বাঃ! ফুলবাবু সেজে মাসীমার বাড়ি। কি মজা মাইরি! যতক্ষণ প্যান্ডেলে ঠাকুর ততক্ষণ সবাই মাঞ্জা দিয়ে ঝিলিক দেয়। কিন্তু শালা খাটবার বেলায় না আগে না পরে কোনো দাদার পাত্তা থাকে না।

– একথা বলছিস কেন? – সে প্রতিবাদ করে, যদিও গলায় বিশেষ জোর ফোটেনা – আমি খাটিনি?

– খাটিনি! – পল্টু ভ্যাঙচায় – কবে ঘি দিয়ে পান্তা খেয়েছিস তো তাই হাতে গন্ধ লেগে আছে। দায় শালা যতো যেন আমার। যেন আমার বাপের বিয়ে!

– খামোকা আজে বাজে বকছিস কেন? এখন আবার কি কাজ?

– ওরে শালা, আবার চোখ রাঙাচ্ছে! বলে এখন কি কাজ! তোর অফিস

তোকে যে কেন মাইরি জেনারেল ম্যানেজার করে দেয় না – বলতে বলতে পল্টু থাবা তোলে, পিঠে আদর লাগাবে। সে তৎক্ষণাৎ কায়দা করে পিঠ বাঁচায়।

– ঠিক আছে, মাসীমাকে ঝড়াক্সে প্রণাম করে আধ ঘণ্টার মধ্যে চলে এসো, হিসেব নিয়ে বসতে হবে। হিসেব পত্তর করে আমি এখনই দেখব হাত খরচা বাদ দিয়ে কত টাকা বাঁচছে। বিজয়াসম্মিলনীর জলসা হবে, টাকার ওজনটা দেখতে হবে তো? ফাংশান আমার ভালো চাই। দুর্গাপুজো তো এখানে এক ডজন হয়, আমার মতো ফাংশান কজন করে? এটাই আমার স্পেশাল ব্যাপার। আর হ্যাঁ – এবারে 'অ্যানাউন্স' করবি তুই, বুঝেছিস? তোর ধুতিতে কোঁচা আর পাঞ্জাবীতে গিলে দিয়ে রাখিস।

– আমি মানে ফাংশানে অ্যানাউন্স? সে তো তো করে।

– আলবৎ। তুমি শালা কপ্তে লিখতে পারো, মাসে মাসে ক্লাবে সাহিত্য সভা করতে পারো, আর ফাংশানে অ্যানাউন্স করতে পারবে না? ইয়ার্কি পেয়েছো?

সে রাগ করে চলে যায়। পল্টু চেঁচায় – রাগ করো আর যাই করো ফাংশানে মাইকে না দাঁড়ালে তোমার হিরো হিরো চেহারা আমি একেবারে বাংলার পাঁচ করে দেব!

তারপর ঃ

বিজয়া সম্মিলনী। বিশাল প্যান্ডেলের কারুকার্য করা সামিয়ানার মাঝখানে আলোয় ঝলমল ঝাড়লণ্ঠন, নীচে থৈ থৈ মানুষ আর মানুষ। কোথাও একটি চেয়ারও খালি নেই। চেয়ারের এলাকা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে দৃষ্টি ছড়ায় সে – দাঁড়ানো মানুষের দুর্ভেদ্য দেওয়াল।

সে দাঁড়িয়েছিল মঞ্চের ওপর। সামনে মাইক। এই বিশাল জনতার দিকে তাকিয়ে তার বুক কাঁপছিল। পাঞ্জাবীর পকেটে গোঁজা ধুতির কোঁচা মুঠোর মধ্যে নিয়ে সে আলতো মুখ মোছে। – কাঁপা হাতে কাগজ খোলে, অনেক চিন্তা করে লেখা –

'নমস্কার! তিনের পল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির পক্ষ থেকে শুভ বিজয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শুরু করছি। অন্যান্য বৎসরের মতো এবারেও যে আমরা আপনাদের আনন্দদানের জন্য এই বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করতে পেরেছি এজন্য আমরা নিজেরা গর্বিত। স্বনামধন্য শিল্পীদের অনেকেই এসে গেছেন এবং অন্যান্যরাও এসে যাবেন। তবে আমাদের প্রত্যেক বছরের অনুষ্ঠানের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, আমরা আমাদের এই এলাকার কয়েকজন শিল্পী

– যাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলে আমরা মনে করি, তাদের আমরা আপনাদের সামনে উপস্থিত করে থাকি। এবারেও আমাদের সেই ঐতিহ্য রক্ষা করবো। আশা করি আপনারা এই নতুন শিল্পীদের উৎসাহ দিয়ে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।'

মাইক থেকে সরে সে মঞ্চের পেছন প্রান্তে চলে যায়। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আবার ধুতির কোঁচায় মুখ মোছে। তারপর–

– এই পল্টু, কি রকম বললুম বল্‌তো। ঈষৎ গর্বের ভঙ্গীতে বলে সে।

– থাম্! কি রকম বললুম বল্‌তো। পল্টু ভ্যাঙচায়! হাঁটুতে হাঁটুতে ঠক্‌ঠক্ করছে – যেন গ্রামার বই রিডিং পড়ল – আহারে।

সে একটু মুষড়ে পড়ে। ... এই তোর দোষ– মিউ মিউ করে বলে সে, কিছুতেই তোর মন পাওয়া যায় না। যাঃ! আমি অ্যানাউন্স করবো না! – সে স্টেজ থেকে নামতে যায় – এই মাইরি কি ভ্যানতাড়া করছিস্! – পল্টু ওর হাত ধরে। জানিস এটা আমাদের একটা চ্যালেঞ্জ? দ্যাখনা শালা দেবেশ সেনের থোঁতা মুখ কেমন ভোঁতা করে দিয়েছি! ব্যাটা রেডিওতে চাকরি করে বলে পায়া ভারী হয়ে গেছে। পাড়ার লোক, প্রতি বছর এটুকু করে যাতে অনুষ্ঠানটা ঠিকঠাক হয় – তা ব্যাটা এবছর আমাকে বলে কিনা টাকা দিতে হবে!

– ও টাকা চেয়েছিল নাকি? কই বলিসনিতো? সে অবাক হয়ে রাগ ভুলে যায়।

– বলিনি। বললেই তো তোরা সকলে মিলে বলতিস যাকগে এতো টাকা যখন খরচ হচ্ছে ওকে কিছু দিয়ে দে! আমি শালা পল্টু আছি, কারো রোয়াবী সহ্য করি না, হ্যাঁ! যাক্‌গে, যারা যারা এসে গেছে আমি নামগুলো বলে দিচ্ছি চটপট লিখেনে –

মঞ্চের বাইরে চারিদিকের সমস্ত আলো নিভে গেছে। সহসা মানুষের গুঞ্জন থেমে যায়। রজনীগন্ধার গন্ধে ভারী বাতাসে নিশ্বাস নেয় সে।

– আজকের প্রথম শিল্পী মহুয়া রায় – প্রথম শিল্পীর নাম ঘোষণা করে সে এবং মঞ্চের সিঁড়ির দিকে তাকায় – ঠিক তখন তার বুকের মধ্যে কেমন এক দুঃখ!

আলোকোজ্জ্বল মঞ্চের ওপর দিয়ে হেঁটে আসে একটি মেয়ে। প্রথম বর্ষার মেঘের মতো চুল তার। কাঁধের ওপর বেড় দিয়ে নেওয়া নীল শাড়ির আঁচল। চিকন গালের পাশে দোলে লাল টুকটুকে পাথরের দুল। সবুজ কার্পেটের মাঝে

এসে দাঁড়ায়, বসতে যায়, মুহূর্তে চোখ তুলে দেখে – চোখে চোখ। সহসা স্ফুরিত নাকের পাতায় ঝিকমিকিয়ে ওঠে হীরের মতো নাকছাবি, চোখ নামায়, হারমোনিয়ামের সামনে বসে।

দেখতে দেখতে তার বুকের মধ্যে দুঃখ উত্তাল। এমন দুঃখ সে আর কখনও অনুভব করেনি। একটা দীর্ঘশ্বাস ভারী হয়ে ভেতরে চাপ দেয়, কার্পেটের প্রান্তে বসে পড়ে। ... অনেক অনেক দূরে আছে মেঘমদির মহুয়ার দেশ... সারাদিন সমস্তক্ষণ সেখানে ছায়া ফেলে দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য... আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস রাতের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে ... আমার ক্লান্তির পরে ঝরুক মহুয়া ফুল ... নামুক মহুয়ার গন্ধ...

তার মনে হয় নির্জন বনভূমিতে পাহাড়ের নিম্নগামী পথে সে একা। চারপাশে ঘন অরণ্য এবং সমস্ত চরাচরে দূরবর্তী ঝরণার কলস্বর...

গান শেষ হলে উঠতে যায় মেয়ে, চোখ তোলে, আবারও স্ফুরিত নাকের পাতায় ঝিকিয়ে ওঠে নাকছাবির পাথর, দ্রুত পায়ে চলে যায়।

এতক্ষণ সে যেন ছিল ঘোরের মধ্যে, সহসা প্রকৃতিস্থ হয়, দাঁড়ায়, হাতের কাগজ তুলে পরবর্তী শিল্পীর নাম ঘোষণা করে – কোনক্রমে কথাগুলি শেষ করে স্টেজ থেকে দ্রুত নেমে আসে। এদিকেও গাদাগাদি মানুষ, মাঝ দিয়ে বাঁশ বাঁধা সরু পথ দিয়ে মহুয়া চলে যাচ্ছে; সে দ্রুত এগিয়ে আসে, কাছাকাছি এসে বলে – শুনুন আপনি যেন চলে যাবেন না, সামান্য 'রিফ্রেশমেন্ট'-এর ব্যবস্থা করেছি আমরা – মহুয়া দাঁড়ায় মুখ তুলে তাকায়।

সে এদিক ওদিক তাকিয়ে চোখ তুলে ডাকে – এই বিকাশ – যদিও বিকাশকে সে দেখতে পায়নি তথাপি –

– আপনি ব্যস্ত হবেন না, মহুয়া বলে। সে মহুয়ার মুখের দিকে তাকায় আর টুপ করে শান্ত হয়ে যায়, হাসি হাসি মুখে বলে, আপনার গান খুব ভালো হয়েছে।

– সত্যি! মহুয়া অনেক হাসে। মহুয়ার চোখ দুটিতেও হাসি উপছে পড়ে, নাকছাবির পাথরও ঝিক্ করে হেসে ওঠে।

মহুয়ার এতো হাসিতে সে কেমন সঙ্কুচিত হয়ে যায়, আস্তে আস্তে চোখ সরিয়ে নেয়।

মহুয়ার মুখে কিন্তু হাসি লেগেই থাকে, বলে, কিন্তু আপনি আমাকে 'আপনি' বলছেন কেন? আমার দাদা আনন্দ – আপনার বন্ধু।

– তাই নাকি? সে উচ্ছ্বসিত হয়। আনন্দর সঙ্গে অনেকদিন দেখা নেই। সেই যে ও চাকরি পেয়ে মুম্বাই চলে গেল – কিন্তু আপনাকে আমি কখনো দেখিনি, সে বলে। মহুয়া আবার অনেক হাসে, – 'এখনও আমাকে আপনি বলছেন।'

– 'তুই কি রে? এখানে আড্ডা মারছিস?' – হঠাৎ পল্টু কোথা থেকে উড়ে আসে – 'কারো ওপর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিত হতে পারি না,'

মনে মনে তার খুব রাগ হয় – পল্টুটা যেন কি! মহুয়া তখন খিলখিল করে হাসে, সে রাগ রাগ চোখে মহুয়ার দিকে তাকালে মহুয়া আরও উচ্ছল হয়ে ওঠে, বলে, একদিন আমাদের বাড়ি আসবেন – শুনতে শুনতে সে ফিরে যেতে যেতে একবার মুখ ফেরাতে চায় কিন্তু পারে না। তার কষ্ট হয় – আঃ, আমি একেবারে ভীষণ হ্যাংলার মতো – মহুয়া হেসে হেসে কিভাবে আমাকে – খুব দুঃখ হয় তার।

এভাবে তার জীবনে দুঃখ আসে। দিনের মনে দিন চলে যায়। প্রাত্যহিক জীবনে কোনো পরিবর্তন নেই, অথচ বুকের ভেতর নির্জন বনভূমিতে পাহাড়ের ধাপ বেয়ে বেয়ে সে ক্রমশ নেমে যায় উত্তাল ঝরণার কাছে, সূক্ষ্ম জলকণা রাশি রাশি – ভিজিয়ে দেয় সমস্ত শরীর – চরাচরে গভীর কলস্বর–।

এভাবে ক্রমশ তার দুঃখ বাড়ে, এভাবে ক্রমশঃ বুকের ভেতর ক্ষয়ে যায় মাটি ও পাথর... ক্রমশ নিঃসঙ্গ নিঝুম একটা অনুভূতি তাকে দিনে দিনে জড়িয়ে ধরে।

এভাবেই সময় যায়। তারপর দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার ঃ

শীতের সন্ধ্যা বড়ো দ্রুত নেমে আসে। অফিস থেকে ফিরতে ফিরতেই অন্ধকার। কালো কম্বল গায়ে জড়িয়ে ঝুপ করে যেন শুয়ে পড়ে রাত্রি। চারিদিকে ধোঁয়ার জটলা, নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে। এরকম সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময় নিজেকে খুব বিষন্ন মনে হয় তার। এভাবেই সেদিন সে বাস থেকে নেমেছে, বুকের ওপর পরস্পর ভাঁজ করে রাখে দুই হাত, ধীর পায়ে হাঁটে। হঠাৎ তাকে দ্রুতপায়ে অতিক্রম করে সামনে আসে মহুয়া, সে চমকে তাকায়, এলোমেলো হয়ে যায়, কিছু বলতে ভুলে যায়।

মহুয়া অজস্র হাসে, গায়ে জড়ানো লাল রঙের শাল খসে পড়তে চায়, নাকের নাকছাবি হীরের মতো ঝিকমিকিয়ে ওঠে। – অফিস থেকে ফিরছেন? মহুয়া জিজ্ঞাসা করে। সে ঘাড় নাড়ে, স্বাভাবিক হতে চায়, ফুলহাতা সোয়েটারের হাত দুটো খানিকটা গুটিয়ে নেয়, বলে, 'আপনি'?

মহুয়া খিলখিলিয়ে হাসে, এবং সে ভীষণ দমে যায়।

মহুয়া হাসির দমক থামিয়ে বলে, 'আবার আপনি?' সে কিছুটা যেন বিহ্বল হয়ে যায়, বলে, 'তুমি কোথায় গিয়েছিলে?'

ঈষৎ ঘাড় কাৎ করে কয়েক মুহূর্ত শান্ত তাকায় মেয়ে, ঠোঁটেক কোণে চাপা হাসি, বলে, 'উঁ!' – মানে, যেন এইতো ঠিক হয়েছে দেখছি। তারপর গায়ের শাল গুছিয়ে নিতে নিতে বলে, আমি বালিগঞ্জ গিয়েছিলাম – গানের স্কুলে।

– তুমি কোথায় গান শেখো? – অভিভাবক সুলভ ভারী গলায় সে প্রশ্ন করতে চায়।

– শিখি নয়, শিখতাম – দক্ষিণীতে, আপনি জানেন?

– জানি না! রেডিওতে প্রোগ্রাম শুনেছি কতবার! কিন্তু শিখতাম বলছ কেন? ছেড়ে দিয়েছ নাকি?

– বারে, তা কেন? কোর্স শেষ হয়ে গেল, পাশ করে গেলাম, এইতো সামনের রবিবার আমাদের সমাবর্তন উৎসব, রবীন্দ্রসদনে, আপনি যাবেন? আমাদের সার্টিফিকেট দেবে, গানটানও হবে। জানেন আমি ফার্স্ট হয়েছি! – মহুয়া বালিকার মতো ঘাড় কাত করে বলে, চোখ বড়ো বড়ো করে, সে মুগ্ধ হয়ে অপলক তাকায়।

মহুয়া হাতের ব্যাগ খোলে, ঘাড় নীচু করে খোঁজাখুঁজি করে কার্ড বার করে, ওর দিকে এগিয়ে ধরে, বলে ঠিক যাবেন তো? সে হাত বাড়িয়ে কার্ড নিতে যায়, কিন্তু ঈশ্বর অথবা শয়তান তাকে অপদস্থ করে – কার্ডটা হাত থেকে মাটিতে পড়ে যায়। মহুয়া খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, আবার লাল টুকটুকে শাল এলোমেলো হয়ে যায়, আবার নাকছাবি হীরের মতো ঝিকমিকিয়ে ওঠে। সে অস্ত্রচ্যুত্য পরাজিত সৈনিক যেভাবে নীচু হয়ে অস্ত্র কুড়িয়ে নেয় সেভাবে কার্ডটা তোলে তারপর যাবার জন্য পা বাড়ায়। মহুয়ার মুখে তখন হাসি লেগেই থাকে, পিছন থেকে বলে, 'একদিন আমাদের বাড়ি আসবেন।'

তার ডানদিকে সীট উপছে পড়া একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক এবং বাঁদিকে একটি পুঁচকে ছোট্ট মেয়ে যে বারবার ঘাড় উঁচু করে মঞ্চের দিকে দেখতে চাইছিল। সে বাঁদিকে হেলে বসল, তখন মঞ্চের পর্দা সরে যাচ্ছে, হলের আবছা আলোগুলি নিভে গেল।

রবীন্দ্রসদনের লবিতে সে অনেকক্ষণ এদিক থেকে ওদিক পায়চারি করেছে, কখনো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকেছে। অজস্র মানুষ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছিল, হলের ভেতর ঢুকে যাচ্ছিল। কেউ কেউ এলোমেলো দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। এইসব মানুষজনের মাঝে অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ ব্যথা – সুতরাং সে হলের ভেতর আসে এবং আবছা আলোয় তীক্ষ্ণ চোখে খানিকক্ষণ এদিক ওদিক তাকায়, ইচ্ছা হয় গোটা প্রেক্ষাগৃহ একবার ঘুরে নিতে কিন্তু পারে না, অতঃপর নিজের আসন খুঁজে নিয়ে বসে।

মাল্যদান ভাষণাদি চলাকালীন সে পিছনে হেলান দিয়ে চুপচাপ, কখনো বা চোখ বুজে থাকে এবং একসময় মাইকে মহুয়ার নাম – সে চমকে ওঠে, সোজা হয়ে বসে, দূর থেকে দেখে মহুয়া মঞ্চের পাশ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায়, 'সার্টিফিকেট' নেয়, প্রণাম করে – অপর প্রান্ত দিয়ে নেমে যায়। কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র – আবার অন্ধকারে হারিয়ে যায় মহুয়া।

একে একে নাম ডাকা চলছিল, একজন করে মঞ্চে উঠে যাচ্ছিল, এবং এই ভাবে একঘেয়ে দৃশ্য – তার কিছুই ভালো লাগছিল না। অন্ধকার তার বুকের ওপর ক্রমশঃ ভারী। দূরে আলোকোজ্জ্বল মঞ্চ – তার ইচ্ছা হচ্ছিল ওখানে চলে যায়, মহুয়াকে খুঁজে নেয়, পাশাপাশি বসে তাহলে মধুময় হয়ে উঠবে সময়...।

এইভাবে একসময় এইসব ব্যাপার শেষ হলে মাইকে ঘোষিত হয় পাঁচ মিনিট বিরতি এবং তারপর সঙ্গীতানুষ্ঠান শুরু হবে। চারিদিকে আবছা আলো জ্বলে ওঠে, অনেকে উঠে বাইরে যায়। সে কিন্তু চুপচাপ বসে থাকে, একেবারে সামনের সারির দিকে চোখ, সেখানে দাঁড়িয়ে মহুয়া একজন মহিলার সাথে কথা বলছে। এত দূর থেকেও সে বুঝতে পারে মহুয়া একটুও হাসছে না বা দুলছে না, খুবই স্বাভাবিক শান্ত হয়ে কথা বলছে। তারপর মহুয়া ধীর পায়ে এগিয়ে আসে, 'প্যাসেজের' ওপর দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকায়, আবার একটু এগিয়ে দাঁড়ায় আবার এদিক ওদিক দেখে, এভাবে তাকে অতিক্রম করে যায়।

মহুয়া কি আমাকে খুঁজছে? – সে ভাবে। মনে ভাবে একবার উঠে দাঁড়ায় হাত তুলে বলে – মহুয়া এই যে আমি এখানে – পরক্ষণে একটা ভয় তাকে দমিয়ে দেয় – তাহলেই তো মহুয়া তীক্ষ্ণ হেসে উঠবে, আর এই যে চারিদিকে অজস্র মানুষ তাকিয়ে দেখবে, তখন? আর ওঠা হয় না, দুহাতে মুখ গুঁজে বসে থাকে, ভাবে, – না মহুয়া আমাকে খুঁজছে না, আমাকে খুঁজবে কেন? নিশ্চয় ওর মা বাবা বন্ধু বান্ধব অনেকে এসেছে – তাদের কাউকে খুঁজছে...।

আলো নিভে যায়। মঞ্চের পর্দা সরে যাচ্ছে। সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়, বেরিয়ে আসে, তখন সমবেত গান আরম্ভ হচ্ছে, গুরুগম্ভীর ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে, সুরধ্বনি তাকে একবার বুঝি পিছনে টানে, কিন্তু সে জোর পায়ে হেঁটে হল থেকে বেরিয়ে আসে।

নির্জন ক্যাথিড্রাল রোড দিয়ে হাঁটে সে। হু হু করে শীতের বাতাস। গায়ের শাল ভালো করে জড়িয়ে নেয়, তথাপি শীত যেন তার বুকের গভীরে ঢুকে কাঁপায়। কোথাও জনপ্রাণী নেই, শুধু দুপাশে গাছেরা আর আলোকস্তম্ভেরা। নিজেকে তার খুব অসহায় মনে হয়, মনে হয় নির্জন কোনো দ্বিতীয় পৃথিবীতে নির্বাসিত...।

[তিন]

মা বললেন – কি রে টাকা ফেরৎ পেলি?

সে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে।

– তবে মুখ অমন গোমড়া কেন?

সে অত্যাধিক উচ্ছ্বসিত হতে চায় – কি যে বলনা! গোমড়া আবার কোথায় দেখছো? জানো মা আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম বুঝি কন্ডাক্টরের সঙ্গে ঝগড়া করতে হবে, কিন্তু কোথায় কি! বলতে না বলতে টাকাটা দিয়ে দিল, আবার বলে কিনা আপনি কখন নেবে গেছেন, আমি কতো খুঁজলাম ... এভাবে অনেক কথা বলতে চায় সে এবং বলতে বলতে ঘরে চলে যায়।

... সকলেই আমাকে ইদানিং এই কথা বলে। আমি কি দিনে দিনে খুবই বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছি? তাহলে? আমার মুখে চোখে চেহারায় তাহলে কি দৈন্য ফুটে উঠছে?

ঘরে আলো জ্বালায় না, কিছুক্ষণ চুপচাপ মেঝেতে দাঁড়িয়ে থাকে অন্ধকারে, তারপর ঝুপ করে বিছানায় শুয়ে পড়ে, বালিশে মুখ গুঁজে নিথর পড়ে থাকে।

... সারাক্ষণ আমি এক তীক্ষ্ণধার অস্ত্র বহন করছি বুকের মধ্যে – সারাক্ষণ যন্ত্রণা, কষ্ট, তবু– তবু মনে হয় কতকাল দেখা হয়নি – যদিও দেখা মানেই যন্ত্রণা – তথাপি বুকের মধ্যে হু হু করে ওঠে হাহাকার। আঃ, এভাবে অন্ধকারে নিঃশব্দে নিঃশেষ হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। মহুয়া একদিন আমি তোমার সামনে নতজানু হবো ... না মহুয়া আমি এখান থেকে অনেক দূরে কোথাও চলে যাবো ...

ঠিক এই কথা যখন তার মনে আসে তখন সে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে সুইচ টিপে আলো জ্বালায়... ঠিক কথা, আমি অফিসে বদলির জন্য চেষ্টা করতে পারি, যদিও বদলির সেরকম কোনো ব্যবস্থা নেই তবু চেষ্টা করে আমি অন্য কোনো প্রদেশের ব্রাঞ্চ অফিসে চলে যেতে পারি – হ্যাঁ এভাবেই, একমাত্র এভাবেই আমি মুক্ত হয়ে যেতে পারি...।

অথচ পুনরায় মুখোমুখি তখন আবার বুকের ভেতর নির্জন বনভূমি এবং জলপ্রপাতের শব্দ চরাচরে, রাশি রাশি সূক্ষ্ম জলকণা ভিজিয়ে দেয় মুখ চোখ সমস্ত শরীর... সে মহুয়ার কাছে এগিয়ে যায়।

অফিসে প্রায় সাড়ে সাতটা পর্যন্ত সে কাজ করেছে। পূজা বোনাস সংক্রান্ত হিসাব নিকাশ শেষ করে ফেলার জন্য সে কাজ করছিল। কাজ করতে করতে হঠাৎ কি হলো – সে মুখ তুলেছিল আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ জুড়ে ছিপছিপে অন্ধকার... কয়েক মুহূর্ত... আবার সব ঠিকঠাক।

ইদানিং মাঝে মাঝে এরকম হয়ে যায়। ইদানিং প্রায়শই রাত্রে ভালো ঘুম হয়না এবং সারাদিন ক্লান্তি আর অবসাদ জুড়ে থাকে সমস্ত শরীর।

সে কাগজপত্র গোটায়, ফাঁকা বিশাল হলঘর, একরাশ চেয়ার টেবিল যেন ঘুমিয়ে আছে, অনেকটা দূরে দারোয়ান বসে আছে তার অপেক্ষায়, সে গলা তুলে ডাকে।

বাস স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়ায় সে, ভাদ্রের গুমোট গরমে আর ক্লান্তিতে মাথার মধ্যে জটলা ভাব, ওপরে তাকায়, মনে হয় যেন মেঘ করেছে, ভেবে নেয় এখন সোজাসুজি একেবারে বাড়ি যাওয়ার বাস এখান থেকে পাওয়া যাবে না, হাওড়ায় গিয়ে বাস বদল করতে হবে। সুতরাং হাওড়াগামী একটা বাসে উঠে পড়ে সে।

হাওড়া স্টেশনের বাস টার্মিনাসে সে যখন পৌঁছায় তখন টিপ টিপ বৃষ্টি শুরু হয়েছে, দ্রুত পা চালায় এবং বাসের কাছাকাছি পৌঁছলে বাসের জানালায় মহুয়ার মুখ – তার দিকে তাকিয়ে।

... দেখা হয়নি কতকাল... কতকাল... মহুয়া তুমি আমাকে নির্জন কোনো দ্বিতীয় পৃথিবীতে নির্বাসন দিয়েছ – এরকম ভাবতে ভাবতে বুকের ভেতর জলপ্রপাতের শব্দ নিয়ে সে বাসে উঠে পড়ে এবং মহুয়ার কাছে এগিয়ে যায়। মহুয়া কিন্তু মুখ ফেরায় না, একইভাবে বাইরে চোখ রেখে চুপচাপ বসে থাকে। সে দেখে কোলের

ওপর দুটি হাত অলস, কানের দুলও দোলে না, শুধু বাইরের বৃষ্টির সাথে ফিরফির হাওয়া শুরু হয়েছে সেই হাওয়ায় কপালের আর গালের পাশে চুলগুলি ঈষৎ কাঁপে।

বাসে বসার জায়গা নেই, বরং দু'একজন লোক ইতস্ততঃ দাঁড়িয়ে। বৃষ্টি বাড়ছে, জানালার ধারের মানুষজন শার্সী বন্ধ করে। বৃষ্টি এসে মহুয়ার গা ভিজিয়ে দেয় কিন্তু সে একইভাবে বসে থাকে, জানালা বন্ধ করে না। ওর পাশে বসে এক বৃদ্ধা মহিলা, তিনি বলেন জানালাটা বন্ধ করে দাওনা ভাই, কিন্তু সে নিঃশব্দ। বাস চলতে শুরু করে।

সে হাত বাড়িয়ে জানালা বন্ধ করে দেয় এবং এভাবে তার বাহুতে মহুয়ার গালের স্পর্শ – সহসা শিহরণে সে কেঁপে যায়, চকিতে মহুয়া চোখ তোলে – চোখাচোখি– হাসতে চেষ্টা করে সে, অনেকটা নীচু হয়ে ছিল সোজা হয়ে দাঁড়ায়, মহুয়ার মুখে কিন্তু কোনো অভিব্যক্তি নেই, আস্তে চোখ ফিরিয়ে নেয়, যেন চেনেই না।

তার খুব কষ্ট হয়।... ঠিক আছে আমিতো চলেই যাবো অনেক দূরে... এরকম ব্যবহার তোমার ... এতো ভালোই, অন্ততঃ সেই তীক্ষ্ণ হাসির চেয়ে এই অবহেলা অনেক অনেক ভালো...

ভালো, তথাপি তার কষ্ট বাড়ে, দাঁড়িয়ে থাকতে পা ব্যথা করে, হ্যান্ডেল ধরে রাখা হাতদুটো খুব ভারী মনে হয়। কন্ডাক্টর টিকিট চায়, সে দুটো টিকিট কাটে, কন্ডাক্টর জিজ্ঞাসা করে আরেকজন কে – সে মহুয়াকে দেখিয়ে দেয়।

... শুনছ মহুয়া, আমি অনেক দূর চলে যাবো – সে মনে মনে ভীষণ চিৎকার করে বলে, কিন্তু কোনো পরিবর্তন নেই, সেও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে এবং মহুয়াও নীরব।

কিছুক্ষণ পর তার পাশ থেকে কে যেন বৃদ্ধাকে হাত বাড়িয়ে ডাকে এবং নেমে যায়, কিন্তু তার বসতে ইচ্ছা করে না – শুনছ মহুয়া, তোমার পাশে বসার জন্য আমার একটুও ইচ্ছা করছে না – সে মনে মনে বলে, অথচ বসে পড়ে। হাতে টিকিটদুটো নিয়ে সে নিবিষ্ট মনে নানাবিধ খেলা করে, টিকিটের নম্বর ইত্যাদি সব খুঁটিয়ে বারবার পড়ে এবং একবারও মহুয়ার দিকে তাকায় না। এভাবেই বাস চলে। বাইরে তুমুল বৃষ্টি হয়, মাঝে মাঝে বাস থামে, লোক নামে এবং ক্রমশঃ বাস ফাঁকা হয়ে যায়।

টার্মিনাসে বাস যখন পৌঁছয় তখন তারা দুজন ছাড়া আর একজন লোক – তার হাতে ছাতা – দিব্যি নেমে যায়। কন্ডাক্টর দুজন নেমে ছুট দেয় গুমটির দিকে। মহুয়া উঠে দাঁড়ায়।

তার খুব রাগ হয়, ওকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য জায়গা দেয়না, শুকনো শুকনো গলায় বলে – বৃষ্টি খুব জোরে পড়ছে। মহুয়া কোনো কথা বলে না দাঁড়িয়েই থাকে এবং সেও ওকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য জায়গা দেয় না। এভাবে কিছুক্ষণ, তারপর মহুয়া বসে পড়ে। ড্রাইভার বাসের আলো নিভিয়ে দেয়।

– আলোটা জ্বলুক না, সে চেঁচিয়ে বলে কিন্তু ড্রাইভার বোধহয় শুনতে পায় না। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি ঝরে যায়, অন্ধকারে তারা দুজন অপিরিচিতের মতো বসে থাকে।

এভাবে সময় যায় – তার মনে হয় এক যুগ সে এভাবে বসে আছে এবং বুকের ভেতর কোনো অনুভূতি বেঁচে নেই, না দুঃখ না সুখ এক অদ্ভুত অবস্থা নিয়ে বসে থাকে।

ক্রমশঃ বৃষ্টি থেমে আসে, অন্ধকার চোখে সয়ে গেছে, মোটামুটি আবছা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সব, সে উঠে দাঁড়ায়, শুকনো গলায় বলে, মনে হচ্ছে বৃষ্টি থেমেছে। মহুয়ার পাথরের মূর্তি নড়ে চড়ে, উঠে দাঁড়ায়।

খুব পাতলা ফিনফিনে বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তারা পাশাপাশি হাঁটে, মহুয়ার বাড়ির রাস্তার মুখ ক্রমশঃ এগিয়ে আসে।

গলির মুখে এসে মহুয়া এগিয়ে যায় এবং তখন না সুখ না দুঃখ এরকম অসাড় বুকের মধ্যে হঠাৎ ছলকে ওঠে রক্ত, সে বুঝতে পারে মহুয়া তাকে চিরকালের মতো নির্বাসন দিয়ে চলে যাচ্ছে।

– মহুয়া যাচ্ছো? সে নিম্নস্বরে বলে, তার কণ্ঠে আর্তি। মহুয়া ঘুরে দাঁড়ায়, বুকের কাছে জড়ো করা দুই হাত, দৃষ্টি অভিব্যক্তিহীন, কথা বলে না শুধু মাথা নাড়ে। তার গলায় ঠেলে ওঠা ব্যথা, দৃষ্টি ঈষৎ ঝাপসা হয়ে আসে, বলে 'ও'! তারপর ফিরে যায়।

– 'আপনি তো একদিনও আমাদের বাড়ি এলেন না,' মহুয়া বলে।

সহসা কেঁপে ওঠে সে, বুকের মধ্যে জলপ্রপাত গর্জনে উত্তাল, সে ফেরে, মহুয়ার কাছে এগিয়ে আসে, দেখে মহুয়ার ঠোঁট কাঁপে, চোখের পাতা বারবার ওঠে নামে আর ম্রিয়মান নাকছাবির পাশ দিয়ে টুপ টুপ করে গড়িয়ে পড়ে অশ্রু।

স্বীকারোক্তি

যদি কোনদিন কোনো মেয়েকে একথা বলে থাকি – শোনো, আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে ছাড়া জীবনের কথা ভাবতে গেলে কেমন অর্থহীন মনে হয়, – আর এইসব আন্তরিক কথা শুনেও সে যদি উদাসীন থাকে, তাহলে?

শুনে তিনি মিষ্টি হাসলেন, তাহলে বেশ একটা মিষ্টি ব্যাপার বাধিয়েছো বলো! শুনতে ইচ্ছা করছে!

অবিবাহিত এই পঞ্চাশ উত্তীর্ণ বয়সেও উনি আশ্চর্য রকমের রোমান্টিক, ওনার মতো রোমান্টিক গল্প আর কেউ লিখতে পারেন না একথা সাহিত্য পিপাসু সকলেই বলে থাকেন। আমি ওনার প্রিয় অনুরাগীদের একজন, আমার বয়সী অনেকের সঙ্গেই ওনার বন্ধুত্বের সম্পর্ক আছে আর আমাদের শ্রদ্ধাও আছে বইকি। আমার সঙ্গে যখনই দেখা হয় টুকটাক অনেক কথাবার্তার সঙ্গে উনি একসময় জিজ্ঞাসা করবেন, কি হে, বিয়ে করছ না কেন? চোখে মুখে বেশ একটা মিষ্টি হাসি খেলা করে। কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে তিনি চোখে চোখ রেখে খানিকক্ষণ চুপচাপ চেয়ে থাকেন, আমি একথা সে কথায় প্রশ্নটা এড়িয়ে যাই।

আজ রবিবার সকালে ওনার ঘরে যখন এলাম তখন দাড়ি কামাচ্ছেন, গালে একরাশ ফেনা, আমাকে ইশারায় বসতে বললেন। বিছানা এলোমেলো, চাদরটা ময়লা হয়েছে বেশ, বিছানার ধারে টেবিলে এলোমেলো বই, ধুলো এখানে ওখানে, আর একটা অর্ধসমাপ্ত লেখা। আমি বিছানায় বসে লেখাটি পড়তে চাইছিলাম, উনি আহা আহা করে উঠলেন, আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম, বললেন, দেখোতো, রবিবার সকাল বেলায় জ্বালাতে এলে অথচ যদি বিয়ে করতে নির্ঝঞ্ঝাটে ছুটির সকালে দিব্যি মুখোমুখি বসে চায়ের পেয়ালা নিয়ে গল্প করতে পারতে। তখন আমি বললাম যদি কোনদিন কোনো মেয়েকে একথা বলে থাকি শোনো আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে ছাড়া জীবনের কথা ভাবতে গেলে সব কেমন অর্থহীন মনে হয়, আর এই সব আন্তরিক কথা শুনেও সে যদি উদাসীন থাকে, তাহলে?

শুনে তিনি মিষ্টি হাসলেন, বললেন, তাহলে বেশ একটা মিষ্টি ব্যাপার বাধিয়েছো বলো! শুনতে ইচ্ছা করছে।

বয়সের সাথে সাথে মনের ওপর দেখছি স্রোতের দাগ পড়ছে। মুখের ওপর দুএকটি করে রুক্ষ রেখা জন্ম নিচ্ছে না কি? মাঝে মাঝে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে মুখ দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়, মুখের ওপর স্রোতের দাগ দেখি, এখন

রোমান্স একটি অর্থহীন শব্দ বলে মনে হয়, একদা যে আবেগ উচ্ছ্বাসের স্রোত বেগবতী ছিল হৃদয়ে এখন তার চিহ্ন খুঁজতে গেলে হতাশ হতে হয়, অথচ আমি মধ্য যৌবনে আছি।

... সম্ভবতঃ প্রত্যেক যুবক যুবতীর কিছু না কিছু দুর্বল সংলাপ মনের কোণে গোপন প্রকোষ্ঠে রয়ে যায়, কিছু আন্তরিকতা কিছু সহানুভূতি কিছু চপলতা দিয়ে উচ্ছ্বাস জাগাতে পারলে সেই গোপনতা অল্পস্বল্প প্রকাশিত হয়ে পড়ে, এবিষয়ে ওনাকে আমার অত্যন্ত পটু মনে হয় এবং আমার ধারণা ওঁর রোমান্টিক লেখাগুলির উৎস সেখানেই, না হলে এই পঞ্চাশ উত্তীর্ণ বয়সের মানুষটি অমন লেখা লেখেন কি ভাবে...

কি হে, কি ভাবছ? উনি বললেন, একটু চমকে উঠলাম আর হেসে ফেললাম।

দাড়ি কামানো শেষ হয়ে গিয়েছিল, উনি আমার দিকে ফিরে বসলেন, পূর্বের জানালা দিয়ে রোদ্দুর পড়েছে তাঁর মুখের একাংশে, হাসি হাসি মুখে বললেন, নাও বলো।

বললাম, কি বলব?

তোমার প্রেমিকার নাম!

জানিনা।

আচ্ছা ঠিক আছে তবে বলো কোথায় প্রথম দেখা, দুপুরে না সন্ধ্যায় অথবা সুপ্রভাতে, ঘরে অথবা পথে, উৎসবের আসরে নাকি –

সে একটা হঠাৎ কিছু –

উঁ! বেশ!

একদিন দুপুরে অফিসে কাজের মধ্যে আছি এমন সময় এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি শুনলাম হাওড়ায় থাকেন, হরিদাস মিত্র লেনে? আমি ঘাড় নাড়লাম, তিনি সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, আমি এখানেই চাকরি করি, পার্সোনেল ডিপার্টমেন্টে, যদি কিছু মনে না করেন আপনাকে একটা অনুরোধ জানাই, বললাম বলুন, বললেন আপনি চ্যাটার্জী পাড়া চেনেন? বললাম হ্যাঁ আমাদের কাছাকাছি, ভদ্রলোক অনেক বিনীত ভাবে বললেন ওখানে তাঁর দাদার বাড়ি, কালকে ওখানে যাওয়ার কথা আছে কিন্তু এমন অসুবিধা – তাঁর মেয়েকে দেখতে আসবে সুতরাং তিনি যেতে পারবেন না অথচ ওখানে দুপুরে যাওয়ার কথা, বৌদি হয়ত না খেয়ে বসে থাকবেন বেলা পর্যন্ত সুতরাং আমি যদি

দয়া করে একটা চিঠি পৌঁছে দিই তাদের বাড়িতে এবং অসুবিধার কথা বলে আসি – অবশ্য মোবাইলে বলে দেওয়া যেত, আমি তো বুড়ো মানুষ, আমার ধারণা লিখে দুঃখ প্রকাশ করলে অনেক গুছিয়ে বলা যায়, তবে অফিস থেকে ক্লান্ত হয়ে ফেরা তবু ইত্যাদি।

আমি সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে খেয়েদেয়ে বেরুলাম, যদিও একটু বিরক্তি লাগছিল তবু ঠিকানা খুঁজে সেই বাড়িতে পৌঁছলাম এবং কড়া নাড়লাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে দিল একটি মেয়ে, বাইরের ঘরে বসে পড়াশোনা করছিল বোঝা যায়, আমি রমেনবাবুর খোঁজ করতে সে বলল বাবা বাড়ি নেই, আমি খুব অসুবিধায় পড়লাম। যাই হোক, বললাম সোমেনবাবু আমাকে পাঠিয়েছেন একটা চিঠি দিয়ে।

ভেতরের দরজায় একজন মহিলা এসে দাঁড়িয়েছিলেন; মেয়েটির মা, আমি তাঁর দিকে তাকালাম, বললাম, উনি কাল আসতে পারবেন না, শুনে মহিলা আমাকে বসতে বললেন। মেয়েটি একটু ছটফটে, তার চোখেমুখে কেমন একটা দুষ্টু মিষ্টি হাসি আছে কোথায় যেন, সে দীর্ঘাঙ্গী এবং সুশ্রী, সম্ভবতঃ ডিগ্রী কোর্সের ছাত্রী – বিজ্ঞানের। আমি বসেছিলাম, সে টেবিলে ঈষৎ ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং তার হাত টেবিলক্লথের কোণ নিয়ে খেলা করছিল। তার মায়ের সঙ্গে আমি বিভিন্ন কথোপকথনে –

– আমি এখানেই থাকি, হরিদাস মিত্র লেন-এ, আমরা এক অফিসে চাকরি করি, উনি আমাকে অনুরোধ করলেন চিঠিটি পৌঁছে দেওয়ার জন্য –

মহিলা আসছি বলে ভেতরে গেলেন এবং মেয়েকে ডাকলেন, তারপর আমি ওমলেটের কুটি দেওয়া চিড়েভাজা এবং চা পেলাম। মেয়েটি দুকাপ চা আনছিল তার মা তাকে মৃদুস্বরে ধমক দিচ্ছিলেন তুই আবার চা খাবি, মেয়েটি বলল আহা ভদ্রলোক একা চা খাবেন সেটা ভালো দেখায় নাকি!

এইসব কথাবার্তা আমি শুনে ফেললাম, বুঝলাম সে বারবার চা থেকে ভালোবাসে। তারপর সে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসলো, একটু অন্যমনস্ক ভাবে বলল আপনি কাকুর অফিসে চাকরি করেন – কথাটা একটু অর্থহীন, কারণ একথা আমিতো বলেইছি – আমার চাকরি করার খুব ইচ্ছা জানেন, কাকুকে কত বলি আপনার অফিসে ব্যবস্থা করে দিন, কিছুতেই কান করেন না, আপনি একটু বলবেন তো – ওদিক থেকে মায়ের ধমক – খুকু কি হচ্ছে কি।

এবম্বিধ আলাপ আলোচনার পর এক সময় আমি উঠলাম, সে দরজা বন্ধ

করতে এলো, আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম আসি, সে একটু হাসলো আর আমি তাকে ভালোবেসে ফেললাম .. তারপর কতদিন কতবার ভেবেছি তার সঙ্গে একটু দেখা হোক পথে, এতো কাছাকাছি থাকি – ওপাড়ায় আমার কোনো বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার আছিলায় তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে কখনো সখনো যাতায়াত করলাম, ভাবলাম সে কোন্ কলেজে পড়ে ? কাছাকাছি যে কলেজ আছে সেখানে কোনো একদিন ছুটি নিয়ে ঘোরাফেরা করব এরকম ছেলেমানুষী ভাবনাও ভাবলাম, আমার বোন সেই কলেজের ছাত্রী – একবার ভাবলাম বোনকে জিজ্ঞাসা করব কিন্তু তাও পারলাম না। অফিসে সেই ভদ্রলোক পরদিন এসে একটু ধন্যবাদ জানিয়ে গিয়েছিলেন, তারপর আর কিছু না, কি যে রাগ হয়! একদিন সেই ডিপার্টমেন্টে গেলাম, কোনো কাজ ছিল না, তবুও যেন কাজ আছে এভাবে সেই ভদ্রলোকের টেবিলের সামনে দিয়ে ঘোরাফেরা করলাম কিন্তু ভদ্রলোক এতই কাজে ব্যস্ত যে আমাকে দেখতেও পেলেন না, চোখে চোখ পড়লেও কথা শুরু করা যায় – কেমন আছেন – এত বিশ্রী লাগে। অথচ এভাবেই সময় যায়, দীর্ঘ সময় ধরে মন মধ্যে দুয়ার বন্ধ ঘরে ধুলো জমে – মাকড়সার জাল – ম্লান অন্ধকার – নিত্যকার দিন নিত্য মতো চলে যায় – তবু কখনো সখনো দুর্বলতা শিরশির করে – ইত্যাদি ইত্যাদি, বলতে বলতে আমি হেসে ফেললাম।

উনি বললেন, তারপর বলো।

তারপর আর কিছু নেই, সে সব অনেকদিন হলো।

তবে তুমি যে বললে তাকে বলেছো –

আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম, ভালো লাগছিল না, উদাস গলায় বললাম, বলেছি তো, কতদিন কতবার গভীর রাতে নির্জন ঘরে নিঃসঙ্গ ব্যথায় জানালায় দাঁড়িয়ে বলেছি আমি তোমাকে ভালোবাসি, কখনও ধূসর বিকালে অফিসের ছুটির পর ফুটপাথে জনারণ্যে হাঁটতে হাঁটতে বলেছি, শোনো, আমি তোমাকে ভালোবাসি, কখনও স্বপ্নের মধ্যে সমুদ্রতীরে নিরালা ঝাউবনে কখনও নীল উপত্যকায় নির্ঝরিণী তীরে কখনও মহুয়ার বনে – বলতে বলতে আমি আবার হেসে উঠলাম। জানিনা আমার হাসিতে ব্যথা ছিল কিনা, তিনি আমাকে ধমক দিলেন, – চুপ দুষ্টু ছেলে চুপ, বুক ঠুকে যে এগোতে পারে না তার প্রেমে পড়ার কোনো অধিকার নেই।

অনেকদিন ওনার সঙ্গে দেখা হয়নি, সেদিন কলেজ স্ট্রীটে একটা দোকানে দাঁড়িয়েছিলাম বই হাতে। – এমন সময় কাঁধে মৃদু স্পর্শ, ঘুরে তাকালাম, উনি হাসি

হাসি মুখে চোখ নাচালেন। তারপর দুজনে গল্পকথায় বললেন – এসেছিলাম এক প্রকাশকের কাছে, টাকাকড়ি কিছু পাওয়া গেল, চলো একটু বসা যাক কফিহাউসে।

সন্ধ্যায় কফিহাউসে ভিড় কম, বেশ ফাঁকা লাগছিল, আমরা বারান্দায় শেষ টেবিলে দুজনে মুখোমুখি বসলাম, কাঁচে ঢাকা সবুজ টেবিলে দুহাত ছড়িয়ে তিনি বেশ হেলান দিয়ে বসলেন, একটু আরামসূচক শব্দ করলেন, তারপর আমরা আকাশকুসুম থেকে মাটির বিপ্লব পর্যন্ত বহু কিছু আলোচনা করলাম। একসময় উনি বললেন তোমার প্রেমিকার খবর কি?

আমি বললাম, সে তো আপনি জানেন।

আমি?

হ্যাঁ, গল্পের শেষটুকু আপনি কেমন সাজিয়েছেন তাই বলুন।

বাজে বোকোনা, বরং যদি কিছু বলার থাকে বলো।

সহসা কোথায় যেমন কি ঘটল আমার মধ্যে, আমি কেমন রুক্ষ রূঢ় হয়ে গেলাম, বললাম, আপনি রোমান্টিক গল্পের প্লট খোঁজেন, আমি খানিকটা গল্প বানিয়ে বলেছি, এরপর আর কি বলার থাকতে পারে বলুন, বাকিটুকু আপনি লিখে নিন।

তাঁর ফর্সা মুখে লালের ছোপ ফুটল, তিনি বাঁদিকের ওষ্ঠপ্রান্ত কামড়ে ধরলেন, টেবিলে ছড়ানো তাঁর হাত দুখানা ঈষৎ কাঁপছিল, তিনি সবুজ দেওয়ালে অথবা দূরে জানালার বাইরে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, অবজ্ঞার সুরে বললেন, – তুমি এতটা কাপুরুষ জানতাম না।

অথচ আমি এসব অর্থহীন কথা বলতে চাইনি, কিন্তু কি যেন হয়ে গেল, মনের এতটুকু গোপন ব্যথা অনেকখানি রুক্ষ কথা হয়ে ঝরে গেল। কিন্তু এখন আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে একটা কিছু আবিষ্কার করলাম, তাঁর বুকের মধ্যে কোথায় যেন একটা ব্যথাতুর ঘর দেখলাম, হয়তো বা উপেক্ষিত কিছু হয়তো বা ব্যর্থ কোনো সময় তাঁর জীবনে দাগ রেখে গেছে, আর এখন এইসব উষ্ণ গোপন কথাগুলি হয়তো তাঁর সেই ফেলে আসা বয়সের শূন্যতা কিছু পূর্ণ করে। আমার বুক ব্যথা করে উঠল, আমি তাঁর হাতের ওপর আলতো হাত রাখলাম, বললাম, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি তো প্রতি মুহূর্ত গুণে গুণে প্রার্থনার মতো করে চাই গল্পের শেষটুকু সার্থক হয়ে উঠুক।

মনন দাস
জন্ম ঃ ১৯৪২